KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ১৮/২ ১৮/৩ ১৮/৪	Year of Publication : শ্রাবণ, আশ্বিন ১৩৮৩ কার্তিক - পৌষ ১৩৮৩ মাঘ - চৈত্র ১৩৮৩ Condition : Brittle / Good
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ আমেরিকার চিঠি ১০৯

অসায়াছু, তোশিয়ুকি, আকাহিতো, এমো, মিচিৎসুনার জননী, শিকিবু, তাদামিনে, হিতোমারো, তোশিনারি, উদা, মোরোতাদা, ইয়াকামোচি ॥ জাপানী কবিতা ১১৬

অমলেন্দু দাশগুপ্ত ॥ শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তু ১২২

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ॥ নটি ১৩০

আবু সয়ীদ আইয়ুব ॥ সমাজবাদী পরিকল্পনায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ১৬২

চিদানন্দ দাশগুপ্ত ॥ চলচ্চিত্র ১৭২

অমলেন্দু বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব ॥ আধুনিক সাহিত্য ১৭৪

সমালোচনা—বিনয় ঘোষ, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, বিষ্ণু দে, হরপ্রসাদ মিত্র, অশোক মিত্র ১৯৫

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

* চিত্তে স্ফূর্তি
উত্তম লিভারের লক্ষণ

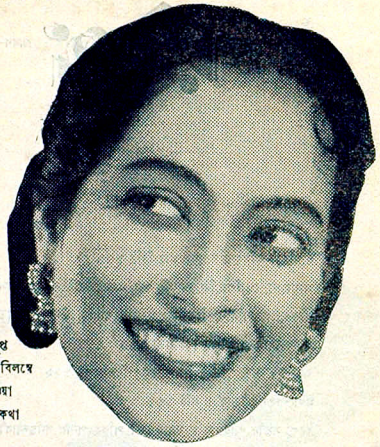

যত গোলযোগ লিভার থেকেই শুরু। আহার্যের সঙ্গে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লিভারের উপর এর পীড়ন বড় কম নয়, ক্রমশঃ অচল করার পক্ষে যথেষ্ট। এর ফলে আপনার পাকস্থলী নানা বিষে জর্জরিত হয়ে পড়ে। মুখে রুচি নেই, চোখে ঘুম নেই, মেজাজ-মর্জি খারাপ, স্বভাবের যত সংগুণ যেন বিলুপ্ত হয়ে আসে। এমন অবস্থায় অবিলম্বে ভালো ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। লিভারজেন্-এর কথা একবার জিগগেস করে দেখবেন।

লিভারজেন

এখন ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যাচ্ছে

লিভারজেন্ এখন ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যাচ্ছে। ব্যবহারে বা বহনে এখন সুবিধে অনেক বেশি। খরচও অনেক কম।

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ, কলকাতা ১৪

P6SL 1

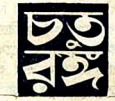

আমেরিকার চিঠি

হুমায়ুন কবির

প্রথম দৃষ্টিতে আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে পার্থক্যগুলিই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়—এবং পার্থক্য যে বহু রয়েছে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমান পৃথিবীতে যে যন্ত্রযুগ চলেছে, তার পরাকাষ্ঠা হয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। ভারতবর্ষে আজো আমরা যন্ত্রসভ্যতার বুনিয়াদ পুরোপুরি স্থাপন করতে পারিনি। ভারতবর্ষে শতকরা আশীজন লোক গ্রামবাসী, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কৃষিনির্ভর। আমেরিকায় শতকরা পনেরো জনেরও কৃষিকাজের সঙ্গে কোন যোগ নেই—অধিকাংশ লোক নগরে সহরে জনপদে বাস করে। তবু আমেরিকা যে-ফসল উৎপাদন করে, তাতে সকলে পর্যাপ্ত খেয়ে-দেয়েও তারা পৃথিবীময় খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করতে পারে। ভারতবর্ষে কিন্তু আমরা প্রয়োজনীয় খোরাক জোটাতে এখনো পারি না, আমেরিকা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধান বা গম আমদানী না করলে আমাদের চলে না। মানুষ বা জন্তুর মেহনত ভিন্ন আমাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকায় যন্ত্রশক্তির ব্যবহারে ঘরে বাইরের সব কাজ সম্পন্ন হয়। কারখানার তো কথাই নেই, ক্ষেতে-খামারে, এমনকি গৃহস্থালির কাজেও দিন দিন যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। যন্ত্রের ব্যবহারে আমেরিকার আর্থিক উন্নতিও অসাধারণ—খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-আসাক, কাঁচামাল বা বিলাস-সামগ্রী সবই অফুরন্ত। ভারতবর্ষে আমাদের জনপ্রতি বার্ষিক আয় তিনশো টাকারও কম—আমেরিকায় বোধ হয় দশ হাজারেরও বেশী। বস্তুতপক্ষে এক মানুষ ছাড়া আমেরিকায় আর কোন জিনিষেরই অভাব নেই। আমাদের সমস্যা জনতার সংখ্যাধিক্য—বহুক্ষেত্রে উপযুক্ত লোকেরও কাজ মেলে না, বেকার হয়ে বসে-থাকতে হয়—আমেরিকার সমস্যা যে কাজ করবার মতন যথেষ্ট লোক নেই, তাই বহুক্ষেত্রে মানুষ কাজ খোঁজে না, কাজ মানুষ খুঁজে বেড়ায়।

পার্থক্যে ফিরিস্তি আরো বাড়ানো চলে। পৃথিবীর ধনীশ্রেষ্ঠ এবং দরিদ্রতম দেশের মধ্যে বহু বিষয়ে অন্তর থাকবে, তাতে বিচিত্র কি? কিন্তু আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বহু বিষয়ে পার্থক্য যেমন রয়েছে, বহু বিষয়ে মিলও তেমনি সুস্পষ্ট। দুই দেশের লক্ষ্য এবং আদর্শে প্রথম দৃষ্টিতে পার্থক্য থাকলেও এক অন্তর্নিহিত গভীর ঐক্য রয়েছে।

দুই দেশেরই আদর্শ সাম্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সকল মানুষের জন্য সুষ্ঠ সামাজিক জীবনের ব্যবস্থা। আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, নানা সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা সকল নাগরিককে সমান সুবিধা ও সুযোগ দান, সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা উপায়ে ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা দুই দেশেই জনকল্যাণ রাষ্ট্র-গঠনের চেষ্টা চলেছে। দুই দেশেই বিভিন্ন ও বিচিত্র সম্প্রদায়ের সমন্বয় ও একীকরণের ভিত্তিতে এক নতুন সুসংবদ্ধ সমাজ-গঠনের প্রয়াস সুস্পষ্ট। দুই দেশের মূল মানবিক আদর্শ এক, এবং দুই দেশেই প্রতিদিনের জীবনে আদর্শ বিচ্যুতির কমবেশী নিদর্শন মেলে।

ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা দুই-ই বিরাট দেশ। বস্তুতপক্ষে আমেরিকা ভারতবর্ষের চেয়েও আয়তনে বড়। ইয়োরোপের সঙ্গে তুলনা করলে এ তফাৎ খুব সহজে ধরা পড়ে। ইয়োরোপে ঘণ্টাখানেক চললেই হাওয়াই জাহাজ একদেশ অতিক্রম করে অন্য দেশে পৌঁছে যায়। ভারতবর্ষে দিল্লী থেকে মাদ্রাজ যেতে সাত আট ঘণ্টা সময় লাগে, আমেরিকায় নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো যেতেও দিন কেটে যায়—সারাদিন চলেও হাওয়াই জাহাজ দেশের সীমানা অতিক্রম করল না, ইয়োরোপে এ-রকম ঘটা সম্ভব নয়। রেলগাড়ীতে বা মোটরে চললে আমেরিকা বা ভারতবর্ষের বিরাট আয়তন আরো ভাল করে বোঝা যায়।

বিরাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়াও ভিন্ন রকমের। ভারতবর্ষে যেমন হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের চিরগ্রীষ্মের মৌসুমের পরিচয় মেলে, আমেরিকায়ও তেমনি কঠোর শীত এবং কঠিন গ্রীষ্মের প্রভাব সমান ভাবে উপলব্ধি হয়। দুই দেশেই পাহাড় পর্বত বনজঙ্গল অধিত্যকা উপত্যকা সমভূমির অভাব নেই।

ভারতবর্ষের মতন আমেরিকার জনসংখ্যাও বিচিত্র। বহু বিভিন্ন জাতি, দেশ, ধর্ম ও ভাষার নানা সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে বর্তমানের মার্কিন জাতি গড়ে উঠেছে। এ দেশে যেমন আর্য অনার্য দ্রাবিড় চীন শক হূন পাঠান মোগল প্রভৃতি নানা মানুষের বিচিত্র ধারার সমাবেশে ভারতীয় জাতিত্ব, আমেরিকায়ও ঠিক সেই একই ইতিহাসের পরিচয় মেলে। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ এবং জাতির তো কথাই নেই—ইংরেজ ফরাসী জার্মান রুষ ইতালিয় ওলন্দাজ চেকোশ্লোভাক প্রভৃতি যত স্যাক্সন, টিউটন, ল্যাটিন বা স্লাভনিক জাতি রয়েছে, সবাই আমেরিকায় এসে ভিড় করেছে—এশিয়া আফ্রিকার বহু জাতিও আমেরিকার জনসমুদ্রে বিলীন বা বিলীয়মান হয়েছে। ভারতবর্ষের দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে এ সমন্বয় ধীরে ধীরে সাধিত হয়েছে—আমেরিকায় সব জিনিষই তাড়াহুড়ো করে সম্পন্ন হয়। গত একশো বছরের মধ্যে আমেরিকায় নানা দেশের নানা ভাষার নানা ধর্মের লোক ভেঙে চুরে এক নতুন মানবগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

আমেরিকার বিকাশের এই যে ইতিহাস, তার প্রভাবে মার্কিন নরনারীর চরিত্রে কতগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। লক্ষণ কথাটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছি, কারণ একদিক থেকে দেখলে তাদের গুণ মনে করা চলে, আবার দৃষ্টিভঙ্গীর একটু বদল হলে গুণ দোষে পরিণত হয়। আমেরিকায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে যে জিনিষ প্রথম নজরে পড়ে সেটি হল দেশবাসীর আশ্চর্য সহৃদয়তা ও আতিথ্য। পৃথিবীর সব দেশেই সাধারণ মানুষের মনে বিদেশীর প্রতি সহানুভূতি ও সম্প্রীতির পরিচয় মেলে। সব দেশেই জনসাধারণ বিদেশীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সাহায্য করবার স্পৃহা বোধ হয় অন্য দেশের তুলনায় আরো বেশী প্রবল। এ সহৃদয়তার অন্যতম কারণ আমেরিকার বিকাশের ইতিহাস। প্রধানত ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের লোকেই আমেরিকায় ভিড় করেছে।

স্বদেশে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়নি বলেই তারা দেশত্যাগী হয়েছিল। বহুক্ষেত্রেই কপর্দকহীন অবস্থায় তারা আমেরিকায় পৌঁছেচে, এবং খানিকটা নিজের পরিশ্রমে, খানিকটা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশী লোকের সাহায্যে অর্থ ও সামাজিক স্থিতি অর্জন করেছে। যারা নিজেরা দুঃখকষ্টে মানুষ, তারা সহজেই অন্যের দুঃখকষ্ট বুঝতে পারে। যারা বিদেশে বিভূঁয়ে একান্ত একাকী জীবনযাত্রা সুরু করেছে, তারা যে পরদেশীর প্রতি সহজেই সহানুভূতিশীল হবে, তাতে আশ্চর্য কি? শুধু তাই নয়। যে ভাবে প্রথম যুগে আমেরিকার সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাতে পরস্পরকে সাহায্য না করলে ধনৈশ্বর্য অর্জন তো দূরের কথা, বহু লোকের পক্ষে বেঁচে থাকাই কঠিন হ'ত। সীমাসরহদ্দের লোকেরা চিরকালই অতিথিবৎসল এবং পরস্পরের সহায়ক হয়ে থাকে। তারা হয়তো ভব্যতা জানে না, কিন্তু তাদের হৃদ্যতা এবং দরদ সুস্পষ্ট। আমেরিকার জনসাধারণের চরিত্রেও এ দুটি গুণের পরিচয় মেলে।

পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ পরস্পরের সহযোগিতা আকাঙ্খা করে, এবং তারই ফলে সমাজ গড়ে ওঠে। সামাজিক মনোবৃত্তির একটি প্রধান প্রকাশ আতিথেয়তা। খোরাকের অভাব হলে অবশ্য মনের এ স্বাভাবিক স্পৃহা ক্ষুণ্ন হয়ে আসে। আমাদের দেশে আর্থিক ও সামাজিক সংগঠন বদলের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে জনসাধারণের আতিথেয়তার পরিবর্তন হচ্ছে, তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আগেকার দিনে গ্রামে যখনই অতিথি অভ্যাগত আসত, তাদের আপ্যায়নে কোন ত্রুটি হ'ত না। রাত দুপুরে কারো বাড়ীতে উপস্থিত হলেও গৃহকর্তা অতিথি সৎকারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করত। আজকাল সহরে একজনের জায়গায় দুইজন অতিরিক্ত লোকের খোরাক জোগাতে হলে গৃহস্বামী এবং বাড়ীর কর্ত্রীর ভাবনার অন্ত থাকে না। তার কারণও স্পষ্ট। পূর্বে ধানচাল তরিতরকারীর ততটা অভাব ছিল না। বিশেষ করে গ্রামে সহজেই এ সব জিনিষ মিলত। আজকাল সহরে সংসারের প্রয়োজনমত বরাদ্দ জিনিষ ওজন করে কেনা হয়—তাই হঠাৎ বেশী খাদ্য-দ্রব্যের প্রয়োজন হলে সে দাবী মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া অভাবের সংসারে মানুষের হৃদয়ের প্রসারও কমে আসে। আমেরিকায় বেশীরভাগ লোক প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে। তাই তাদের সমাজে অতিথিসৎকারের রেওয়াজ আজও পুরোপুরি বজায় রয়েছে।

বস্তুতপক্ষে আমেরিকায় সাধারণ লোকের সহৃদয়তা ও অতিথি-প্রীতি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাদের বাড়ীর দরওয়াজা যেন সকলের জন্য উন্মুক্ত। পথে কারো সঙ্গে পরিচয় হল—হয়তো হাওয়াই জাহাজে বা ট্রেনে বা বাসে পাশাপাশি বসে কথার সুরু, এবং তারই ফলে পরিচয়। অথচ সেই অল্পক্ষণের পরিচয়ের ভিত্তিতেই তারা আগন্তুককে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে বসে, বিশেষ করে দূরাগত বিদেশী অভ্যাগতের জন্য তাদের আতিথেয়তার প্রকাশ আরো বেশী দরাজ, বলে, এসে দুচার দিন আমাদের অতিথি হয়ে থেকে যাও। সে আমন্ত্রণ কেবল লোক দেখানো মৌখিক আমন্ত্রণ নয়। গ্রহণ না করলে অনেক সময় তারা ক্ষুণ্ন হয়। নিজে অথবা নিজের পূর্বপুরুষ বিদেশে এসে প্রথম যে অপরিচয় ও অসহায়তা বোধ করেছে, বিদেশী দেখলে যেন তারই স্মৃতি আমেরিকাবাসীর মনে জাগে। অপরের সাহায্য এবং সহানুভূতির ফলে সেই প্রথম সঙ্কোচ ও দ্বিধা কাটিয়ে যে ভাবে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, আজ বিদেশীর প্রতি সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রসারিত করে তারা যেন সেই পূর্বঋণ শোধ করতে চায়।

মার্কিনবাসীর সহৃদয়তা ও অতিথিপ্রীতি ছাড়া আরও একটি গুণ সহজেই বিদেশীর

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মার্কিনসমাজে ছোটবড়র তফাৎ যে ভাবে মুছে গিয়েছে, তা সত্যি বিস্ময়কর। সামাজিক সাম্য এবং গণতন্ত্র বোধ হয় আর কোথাও এত প্রবল ভাবে দেখা দেয়নি। সব রকমের মেহনতের মর্যাদাও অন্য কোথাও এত স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না। ব্যাঙ্কের বা কারখানার ম্যানেজার হয়তো মাসে দশ পনেরো হাজার টাকা রোজগার করে, কারখানার মজুরের অথবা বাড়ীর চাকরাণীর আয় হয়তো মাসে পনেরোশো বা দুহাজার টাকা, কিন্তু তাই বলে ম্যানেজার মজুর বা চাকরাণীর উপর তম্বী করে না। বোধ হয় করতে সাহস পায় না। পৃথিবীর নানা দেশের লোক নানা রকমের সভ্যতা আচারবিচার নিয়ে আমেরিকায় ভিড় করেছে বলে বিশেষ কোন সভ্যতা আচারবিচারের প্রতি তাদের মোহ কম। প্রথম অবস্থায় যখন বনজঙ্গল সাফ করে পাহাড় পর্বত কেটে তারা গ্রাম জনপদ সহরের পত্তন করেছে, তখন শ্রমবিভাগের কথা কেউ ভাবেনি, ভাবা সম্ভব ছিল না। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সামনে যখন যে-কাজ এসেছে তাই করেছে, এবং তার ফলে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি বা ব্যবসায়ের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য আপনা আপনি লোপ পেয়েছে।

বিরাট দেশ, ঐশ্বর্য অফুরন্ত এবং কাজের পরিমাণে লোকসংখ্যা কম বলেও মার্কিন দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তির মর্যাদার এত বিকাশ। পৃথিবীর অন্য প্রায় সব দেশেই কাজের তুলনায় উমেদার বেশী, তাই প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুরুষ সবাইকে রুজীর ভাবনা ভাবতে হয়, কাজের ধান্দায় ঘুরতে ফিরতে হয়। মার্কিন দেশে কাজের তুলনায় লোকসংখ্যা কম বলে সেখানে মানুষ কাজ খুঁজে বেড়ায় না—বহুক্ষেত্রে কাজই মানুষের অপেক্ষায় বন্ধ হয়ে থাকে। মার্কিন ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই মোটামুটি ভাবে এ কথা সত্য। মাঝে দুয়েকবার ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দার দরুণ বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে, কিন্তু পূর্বে বেকার হলেই লোকে পশ্চিমযাত্রা করত, এবং সীমান্তদেশের অনাবাদী জায়গায় বনজঙ্গল কেটে নতুন গ্রাম জনপদের পত্তন করত। এমনি করে যখন মার্কিন দেশের লোক প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে পৌঁছল, তখন তাদের পশ্চিমের অভিযান বন্ধ হল বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ও টেকনিকের নতুন নতুন আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে নতুন ধরনের ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে উঠতে সুরু করল। মার্কিন দেশে যে পৃথিবীর অন্য সব দেশের তুলনায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেশী, কাজের তুলনায় লোকের অভাব তার অন্যতম কারণ।

লোকসংখ্যার অভাব বলে একদিকে যেমন যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধও প্রবল হয়ে উঠেছে। যেখানে মানুষকে সেধে কাজে লাগাতে হয়, সেখানে যে কৃষিজীবী মজুর সকলেই নিজেদের দাবী বাড়িয়ে তুলবে, তাতে বিচিত্র কি? পূর্বেই বলেছি যে বাড়ীর চাকরাণীও মাসে হয়তো পনেরোশো দুহাজার টাকা রোজগার করে, তার চেয়ে কম রুজী বোধ হয় কারোই নেই। একথা হয়তো খানিকটা আশ্চর্য শোনাবে, কিন্তু আমেরিকার সর্বোচ্চ বেতনের তুলনায় সর্বোনিম্ন বেতনের অনুপাত ভারতবর্ষ বা রুষদেশের চেয়ে অনেক বেশী। ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী বা ব্যবসায়ীর আয় সর্বনিম্ন কর্মচারীর আশী গুণ বা একশো গুণ, সাম্যবাদী রুষদেশেও এ অন্তর প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ গুণে, কিন্তু ধনতান্ত্রিক আমেরিকায় অন্তর পনেরো বিশগুণের বেশী নয়। সকল ধরনের রুজীতেই খোরাক পোষাকের সচ্ছল ব্যবস্থা হয় বলে কারো মনে বৃত্তি বা ব্যবসায় সম্বন্ধে কোন হীনতাবোধ নেই। বাড়ীর চাকরাণী সেজেগুজে বিউইক গাড়ী চালিয়ে কাজ করতে আসে, বাড়ীতে পৌঁছে কাজের পোষাক পরে দুতিন ঘণ্টা কাজ করে আবার পোষাক বদল করে বিউইক গাড়ী হাঁকিয়ে ফিরে যায়। কাজের সময়টুকু ছাড়া

বাকী সময়ে মনিব চাকর চারকরাণীর কোন তফাৎ থাকে না। রাস্তায় ঘাটে হোটেলে থিয়েটারে সাজপোষাক বা চলন দেখে কারো বলার সাধ্য নেই যে কে মনিব আর কে চাকরাণী। সকলেই প্রায় একই ধরনের লেখাপড়া শেখে বলে সামাজিক সাম্যবোধ আরো প্রবল হয়ে উঠে।

পৃথিবীর আর কোন দেশেই বোধ হয় এত বেশী সামাজিক সাম্যভাব দেখা যায় না। মানুষে মানুষে প্রায় সমস্ত পার্থক্যই মার্কিন দেশে দূর হয়ে গিয়েছে। কেবল বর্ণবৈষম্যের বেলা তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিগ্রো আমেরিকানদের প্রতি মার্কিন দেশে, বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলে যে অনাদর ও অবহেলা, মার্কিন গণতন্ত্রের পক্ষে এতবড় কলঙ্কের কথা আর কিছুই নেই। দক্ষিণ অঞ্চলে নিগ্রোদের জন্য থাকবার জায়গা আলাদা, খাবার ব্যবস্থা আলাদা, স্কুল হাসপাতাল আলাদা, রেলগাড়ীতে পৃথক আসন। এমনকি রেল-স্টেশনের আসা-যাওয়ার দরজাও আলাদা। এক কল থেকে তারা জল খেতে পায় না, ধর্মানুষ্ঠানের জন্য গির্জা আলাদা, এমনকি মৃত্যুর পরেও আলাদা কবরস্থান। এ সম্বন্ধে দক্ষিণ অঞ্চলের বহু শ্বেত আমেরিকানের মনে কোন দ্বিধা পর্যন্ত নেই। এটাও খুবই বিচিত্র লাগে যে পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ পারশিক, আরবী, ভারতীয়, চীনা, জাপানী, দক্ষিণ আমেরিকান বা আমেরিকার আদিবাসী হলে মার্কিন নাগরিকের মনে সে জন্য কোন খেদ থাকে না, বরং বহুক্ষেত্রে বেশ খানিকটা গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে সে কথা জাহির করে, কিন্তু যদি কোনক্রমে কোথাও বিন্দুমাত্র নিগ্রোরক্তের ছোঁয়াচের সন্দেহ থাকে, তবে সে বিষয় একেবারে চেপে যায়। বস্তুতপক্ষে নিগ্রোরক্তের সম্পর্কের চেয়ে মার্কিনবাসীর পক্ষে গুরুতর অপমান আর কিছুই নেই। প্রকৃতি কিন্তু এ মনোভাবের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থাও দিনে দিনে জমিয়ে তুলছে। প্রায় তিন শতাব্দী একত্র বসবাসের ফলে ইয়োরোপিয়ের ঔরসজাত নিগ্রো-রমণীর সন্তানের সংখ্যা কম নয়। তাদের মধ্যে অনেকের আকৃতি প্রকৃতি চেহারায় পুরো-পুরি ভাবে পিতৃবংশের প্রভাব বিদ্যমান, বহুক্ষেত্রে নিগ্রোরক্তের কোন বহির্লক্ষণের পরিচয় মেলে না। সমাজবিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই আজ এ-কথা মেনে নিয়েছেন যে প্রতি বংসর নিগ্রোবংশোদ্ভূত এই ধরনের প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী বর্ণরেখা অতিক্রম করে শ্বেত আমেরিকানদের মধ্যে বিলীন হয়। ষোলো কোটি লোকসংখ্যায় ত্রিশ হাজার অবশ্য খুবই সামান্য অনুপাত, কিন্তু বৎসরের পর বৎসর এ ভাবে নিগ্রোরক্ত যদি শ্বেত আমেরিকানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, তবে একদিন এমন সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তির পক্ষেই অবিমিশ্র শ্বেতরক্তের গর্ব করা সম্ভব হবে না।

ঐতিহাসিক পরম্পরার ফলেই আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে শ্বেতসম্প্রদায়ের মধ্যে নিগ্রো-বিদ্বেষের প্রথম প্রকাশ। কারো প্রতি অন্যায় করলে অন্যায়কারী স্বভাবতই নিজের কার্যকলাপের জন্য অজুহাত খোঁজে, এবং ফলে নিপীড়িতের প্রতি অনুকম্পা বা সহানুভূতির বদলে বহুক্ষেত্রে বিদ্বেষ ও বিরাগের পরিচয় মেলে। ইয়োরোপ এবং আমেরিকার শ্বেত-সম্প্রদায় আফ্রিকার নিরীহ ও অসহায় নরনারীকে গৃহচ্যুত করেছে, দাসত্বে নিপীড়িত করেছে, এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের মানুষেতর প্রাণী গণ্য করেছে। আমেরিকা যেদিন স্বাধীন হল, সর্বমানবের সাম্য ও ঐক্যের ঘোষণাবাণী প্রচারিত করে পৃথিবীর ইতিহাসে গণতন্ত্রের নতুন যুগ প্রতিষ্ঠা করল, সেদিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষী নিগ্রোসমস্যার কথা ভোলেননি। তখনো সময় হয়নি বলে স্পষ্ট ভাবে নিগ্রোদের স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেননি বটে, কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী এমন ভাবে রচনা করেছিলেন যে তার পরিপূর্ণ প্রকাশে নিগ্রোদের প্রতি অন্যায় দূর হতে বাধ্য।

বস্তুতপক্ষে মার্কিন দেশে যাঁরা চিন্তাশীল ও উদারপ্রাণ, নিগ্রোসমস্যা নিয়ে তাঁদের মনে লজ্জা ও ক্ষোভের অন্ত নেই। লিঙ্কনের নাম আমেরিকার সমস্ত প্রেসিডেণ্টদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত, এবং তার একটি প্রধান কারণ যে দাক্ষণ অঞ্চলে দাসত্ব প্রথা লোপ করে তিনি নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার দিয়েছিলেন। প্রথম যখন এ সমস্যার উদয় হয়, তখন সম-অধিকারের কথা তিনি ভাবেননি, কিন্তু একবার সমস্যা সমাধানে অবতীর্ণ হয়ে তিনি দেখেছিলেন যে জাতির যে কোন অংশকে অপমানের অর্থ সমস্ত জাতির অপমান, দেশের কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে দুর্বল রাখার অর্থ সমস্ত দেশের শক্তিহানি। আজো নিগ্রোজাতির অধিকার সর্বক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু গত বিশ বৎসরে, এবং বিশেষ করে যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধ শেষে আমেরিকার নিগ্রোসম্প্রদায় যে ভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং হচ্ছে, তাতে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার সমাজ জীবনের এ কলঙ্ক দূর হয়ে যাবে। আজ দু'বছর হল আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত করেছে, তার ফলে শিক্ষায়তনে বর্ণবিভেদের প্লানি দূর হতে বাধ্য। যদি শৈশব থেকে শ্বেত অশ্বেত নিগ্রো অনিগ্রো বালক বালিকা স্কুলে কলেজে একই আবহাওয়ায় মানুষ হয়, তবে কালক্রমে বর্ণবিদ্বেষ ও বর্ণবিভাগ বিলুপ্ত হয়ে যাবে এ আশা অন্যায় নয়।

মার্কিন দেশের নরনারীর চরিত্রের আর একটী লক্ষণও সহজেই বিদেশীর চোখে ধরা পড়ে। মার্কিনবাসী কোন জিনিষই বেশীদিন আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় না। তারা ঘর-বাড়ী সহজে বদল করে, পোষাক-আসাক তো অনবরত বদলায়, সামাজিক ব্যবস্থা বা রীতি-নীতি বদলাতেও তাদের বিশেষ আপত্তি নেই। মার্কিনবাসীর এ পরিবর্তনশীলতাও মার্কিন ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী ফল। বেশীর ভাগ মার্কিনবাসী বিদেশাগত। আমেরিকায় কারো এক পুরুষ, কারো দু'পুরুষ তিন পুরুষ, বড়জোর কারো চার পাঁচ পুরুষ কেটেছে। এক পূর্বাঞ্চলে নিউ ইংলণ্ড বা নয়া ইংলণ্ড বাদ দিলে বাকী সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে বসতির পত্তন হয়েছে গত একশো বছরে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির যে সব মানুষ আমেরিকার প্রবল টানে দেশত্যাগী হয়ে বেরিয়ে এল, তাদের প্রায় সকলেই সমাজবিদ্রোহী। নিজেদের সমাজের প্রতি তাদের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। বহুক্ষেত্রে বিরাগ ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। আমেরিকায় এসে এইসব বিভিন্ন সমাজের বিদ্রোহী এবং অসন্তুষ্ট জনপ্রবাহ এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও মিলনের ফলে কোন বিশেষ সমাজব্যবস্থার বন্ধন দিনে দিনে আরো শিথিল হয়ে পড়ল। ইতালিয় রোমান ক্যাথলিক পিতামহ, রুষ সনাতনপন্থী পিতামহী প্রটেষ্টাণ্ট ইংরেজ মাতামহ ও স্প্যানিশ ক্যাথলিক বা জার্মান ইহুদী মাতামহীর পৌত্র-প্রপৌত্র যে কোন বিশেষ ধর্ম বা জাতির জন্য বিশেষ অনুরাগ অনুভব করবে না তাতে বিচিত্র কি? এ পাঁচমিশেলীর ফলে স্থাবর বা শাশ্বত জাতীয় ঐতিহ্য গড়ে উঠা অসম্ভব, এবং নিত্য নূতন পরীক্ষার প্রতি আগ্রহবান হওয়া স্বাভাবিক। আমেরিকার ইতিহাসে যেভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে, তার ফলেও মার্কিনবাসীর মনে নতুনের প্রতি আগ্রহ প্রবলতর ভাবে দেখা দিয়েছে।

আমেরিকার আর্থিক ও সামাজিক জীবনে যে বিরাট সম্ভাবনা, তার প্রতিক্রিয়ায়ও মার্কিনবাসী নতুনের উপাসক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় কেউই বর্তমান নিয়ে তুষ্ট নয়—প্রত্যেকেই ভাবে যে অদূর ভবিষ্যতে সকলভাবে তার উন্নতি হবেই। চাষীর ছেলে রাষ্ট্রপতি হয়েছে, মজুরের ছেলে কালক্রমে মিলের মালিক, বাড়ীর চাকরাণী ভাবে সে সে-ও একদিন চিত্রতারকা হয়ে যশ ও অর্থের উচ্চতম শিখরে উঠবে। কাজেই বর্তমানের আয়ত্ত

জিনিষের প্রতি মার্কিনবাসীর মোহ নেই, অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় তার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ। মার্কিন মনোবৃত্তির এ বিশেষ প্রকাশ আজ একশো বছরেরও আগে দ্য তকভিল লক্ষ করেছিলেন। মার্কিন জাহাজ তেমন মজবুত নয় দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করায় জাহাজী উত্তর দিল যে বেশী মজবুত জাহাজ তৈরী করে কি লাভ? দশ বৎসরের মধ্যে জাহাজ নির্মাণের যে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে, তার ফলে এ ধরনের জাহাজ অচল হয়ে যাবে, কাজেই দশ বছর চলে, তার চেয়ে বেশী মজবুত জাহাজ তৈরীর কোন সার্থকতা নেই! একশো বছর আগে জাহাজের খালাসী যে উত্তর তর্কাভিলকে দিয়েছিল, আজো তাই মার্কিন-বাসীর অন্তরের কথা। ইংরেজ রোলসরয়েস গাড়ী তৈরী করে, পঞ্চাশ বছরেও তার দেহ, তার এঞ্জিন খারাপ হয় না। আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম গাড়ীও পাঁচ সাত বছরের বেশী টেকে না—টেকবার জন্য তৈরী হয়নি। বছর বছর গাড়ী বদলের রেওয়াজ হেনরী ফোর্ডের নতুন অবদান নয়—ফোর্ডের কৃতিত্ব এই যে মার্কিন মনোভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করে তার অভিলাষ পূরণের ব্যবস্থা তিনিই প্রথম করেছিলেন।

[ক্রমশঃ]

কবিতা

জাপানী কবিতা

শরতের ঘাসে হাওয়ার ঝাপটা
শুভ্র শিশিরকণা
চূর্ণ রত্নহারের মত ছড়ায়।

বুনিয়া নো অসায়াসু

শিরা ৎসুইউ নি
কাজে নো ফুকিশিকু
আকি নো নো ওয়া
ৎসুরানুকি তোমেনু
তামা জো চিরিকেরু

শরৎ এসেছে অগোচরে,
বাতাসের স্বরে শুধু কি যে শঙ্কাভাস!

ফুজিওয়ারা নো তোশিয়ুকি

আকি কিনু তো
মে নি ওয়া সায়াখা নি
মিয়েনে দোমো
কাজে নো ওতো নি যো
ও দোরো কারে নুরু

আসুকার স্থির জলে
কুয়াশা ঘনায়।
স্মৃতি অত সহজে মোছে না।

ইয়ামাবে নো আকাহিতো

আসুকা গাওয়া
কাওয়া ইয়োদো সারাযু
তাৎসু কিরি নো
ওমোই সুগু বেকি
কোই নি আরানাকু নি।

পথ চেয়ে থাকা হয়নি ঠিক।
ভালো হ'ত ঢের ঘুমানো, স্বপ্ন দেখা,
সারা রাত জেগে কাটান, আর এই—
মন্থর চাঁদ ডুবতে দেখার চেয়ে।

আকাজোমে এমো

ইয়াসুরা ওয়া দে
নে না মাশি মোনো ওহ্
সাইয়ো ফুকেতে
কাতাবুকু মাদে নো
ৎসুকি ওহ্ মিশি কানা।

একাকী শুয়ে কাঁদার রাত
জানো কি কত দীর্ঘ ?

কম্যান্ডার মিচিৎসুনার জননী

নাগেকি ৎসুৎসু
হিতোরি নুরু ইয়ো নো
আকুরু মা ওয়া
ইকা নি হিসাশিকি
মোনো তো কা ওয়া শিরু।

কে যেন যায়।
সে-ই কি গেল
যখন মরি ভেবে
নিশীথ চাঁদ
মেঘেরা দেয় ঢেকে।

মুরাসাকি শিকিবু

মেগুরি আইতে
মিশি ইয়া সোরে তো মো
ওয়াকানু মানি
কুমো কাকুরেনিশি
ইয়োহা নো ৎসকি থানা

অস্ত যাওয়া চাঁদের মত
শীতল সে জনারে
ছেড়ে আসার পর
মেঘের গায়ে ভোরের আলো
লাগে আমার সব চাইতে বিষ।

মিবু নো তাদামিনে

আরি আকে নো
ৎসুরে নাকু মিয়েশি
ওয়াকারে ইয়োরি
আকা ৎসকি বাকারি
উঁকি মোনো ওয়া নাশি

গ্রীষ্মের ক্ষেতে আগাছার মত
রটনা বেড়েই চলে।
আমি আর প্রিয়া
বাহুবন্ধনে সুপ্ত।

থাকিনোমোতো হিতোমারো

হিতো গোতো ওয়া
নাৎসু নো নো কুসা তো
শিগেকু তো মো
ইমো তো ওয়ারে তো শি
তাজুসাওয়ারিনেবা

কোনো পথ নেই
কোথাও এ পৃথিবীতে
সবচেয়ে দূর পাহাড়েও মৃগ
কাতর কণ্ঠে ডাকে।

ফুজিওয়ারা নো তোশিনারি

ইয়ো নো নাকা ইয়ো
মিচি কোসো নাকেরে
ওমোই ইরু
ইয়াসা নো ওকু নিমো
শিকা জো নাকানারু

পলাতক এক ঢেউএর চূড়া-ই
যেন হিমে জমে গিয়ে
পাহারায় খাড়া শাদা সারসটি
বন্দর মোহানায়।

সম্রাট উদা

আশি তাজু নো
তাতেরু কাওয়া বে ওহ্
ফুকু কাজে নি
ইয়োসেতে কায়েরানু
নামি কা তো জো ওমোউ

পাহাড়ী গাঁয়ে পাতার রাশি
হাওয়ায় মর্মরিত,
স্বপ্নসীমা ছাড়িয়ে কোথা
গহন গভীর রাতে
হরিণ ওঠে ডেকে।

মিনামোতো নো মোরোতাদা

ইয়ামা যাতো নো
ইনাবা নো খাজে নি
নেজামে শিতে
ইয়ো ফুকাকু শিকা নো
কোয়ে ওহ্ কিকু কা না

বসন্তের বাগানে যেখানে
কুসুমিত পীচের আভায়
আলো-করা তলাকার পথ,
কে একটি মেয়ে হেঁটে যায়।

ওতোমোনো ইয়াকামোচি

হারু নো সোনো
কুরেনাই নিওউ
মোমো নো হানা
শিতা তেরু মিচি নি
ইদে তাৎসু ওতোমে

অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তু

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

ভাষা ব্যতিরেকে আলোচনা অসম্ভব, অথচ ভাষা-ব্যবহারের পার্থক্য অথবা বৈপরীত্যেই সৃষ্টি হয় আলোচনার বিকৃতি ও বিভ্রান্তি। তাই ভাষার যথার্থ অর্থ অন্বেষণ যাবতীয় তত্ত্বমূলক আলোচনার প্রাথমিক কর্তব্য বলে স্বীকৃত হচ্ছে। কিন্তু ভাষা-ই তো বই অন্বেষণের একমাত্র পথ; কাজেই অর্থ সম্বন্ধে কোন সর্বজনগ্রাহ্য প্রত্যয় অসম্ভব। কোনো শব্দ বা শব্দসমষ্টির অর্থ কোনো ব্যক্তির কাছে সুনির্দিষ্ট হতে পারে, কিন্তু সেই অর্থ-ই অপর কোনো ব্যক্তির দ্বারা স্বীকৃত কিনা এ কথা নিশ্চিত করে জানবার কোনো উপায় প্রথম ব্যক্তির নেই।

এই সমস্যা অতিশয় জটিল। শব্দ বা শব্দসমষ্টি কোনো কিছুর প্রতীক। ফুল বলে যে পদার্থ ফুল শব্দটা তার প্রতীক। পদার্থ যদি হয় ক, আর তার প্রতীক খ, তাহলে বলা যেতে পারে খ = ক, অথবা ক = খ। কিন্তু সর্বত্রই কি এই সম্পর্ক অবিকৃত থাকে? একটি অতি সাধারণ বাক্যালাপের অংশ ধরা যাক্। "তোমার হাতে কী?" "ফুল।" এই উত্তরের মধ্যে খ শুধু ক-ই নয়, খ = আমার হাতে ক।

কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রতীকের সংগে তার বস্তু বা ভাব-সত্তার কোনো সর্বাবস্থায় অবিকৃত সম্বন্ধ নেই। প্রতীক বা শব্দের অর্থ তার ব্যবহারে। বাক্যগঠনরীতি অনুসারে শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা সংকোচনের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, কোনো শব্দপ্রতীকের পেছনে যে একাধিক বস্তু বা ভাব থাকতে পারে সে কথা তো অভিধান-ই বলে দেয়। বলা যেতে পারে যে প্রতীকের সংগে তার বস্তু বা ভাবসত্তার সম্পর্ক এক : এক নয়, এক : বহু।

শব্দের অর্থ তো শুধু তার অভিধানগত বস্তু বা ভাব-সত্তা-ই নয়, তার সংগে মিশে থাকে আলোচনা-রত ব্যক্তিবর্গের মনের আরো অনেক কিছু। কোনো শব্দ বা শব্দসমষ্টির মৌলিক বস্তুসত্তা বা ভাবসত্তা সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক বোঝাপড়া থাকলেও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা আরোপিত যে অর্থাংশ সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক স্বীকৃতি কঠিন। কোনো শব্দসমষ্টির যে অর্থ আমার কাছে নির্দিষ্ট আপনার কাছে-ও সেই অর্থ-ই নির্দিষ্ট কিনা এ সম্বন্ধে কোনো অবিমিশ্র যুক্তিনির্ভর প্রত্যয় সম্ভব নয়।

ভরসার কথা, আমাদের সব প্রত্যয় নিছক যুক্তিনির্ভর নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একের অর্থের সংগে অপরের অর্থের মিল থাকে। বস্তুপ্রতীকের ব্যবহারে অনেক সময় এই মিলের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ দেখানো যায়। যেখানে প্রমাণ সম্ভব নয়, সেখানেও শব্দব্যবহার সম্বন্ধে আমরা একটা সর্বস্বীকৃত রীতিতে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস থেকেই তত্ত্ব আলোচনা, সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়াস, ভাষা দিয়ে ভাষার অর্থবোধের চেষ্টা।

প্রতীকের সংগে প্রতীকধারীর সম্পর্ক একমাত্র ব্যবহাররীতিতেই স্থাপিত। রীতির বাইরে এই সম্পর্কের কোনো ভিত্তি নেই। আর রীতি যেহেতু স্থানকালপাত্রবিশেষে পৃথক, এই সম্পর্ক-ও সেই অনুসারে বিভিন্ন হতে বাধ্য। এমনকি, নিছক যুক্তির বিচারে কোনো প্রতীক প্রয়োগ-ই অপপ্রয়োগ হতে পারে না। টেবিল বলে যে জিনিষটা পরিচিত তাকে যদি কেউ চেয়ার বলে তাহলে অবিমিশ্র যুক্তি বা মূলগত সম্বন্ধের নজিরে তাকে ভুল বলা চলবে না। ভুল শুধু স্থানকালপাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ রীতির বিচারে। এই রীতির ঊর্ধ্বে প্রতীক ও

প্রতীকধারীর মধ্যে কোন অংগাংগী সম্বন্ধ নিশ্চয়ই নেই।

নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বজনবোধ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য প্রয়োগরীতি স্থাপনের চেষ্টাই মানুষের ভাষাসৃষ্টির ইতিহাস। এই রীতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী বলেই আমরা শুদ্ধ বা ভুল শব্দপ্রয়োগের প্রশ্ন তুলি। কিন্তু শব্দার্থ বা বাক্যার্থের রীতিনির্ভরতার কথা মনে রাখলে ভুল বা শুদ্ধ ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে অনেক নিষ্ফল উত্তেজনা ও বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

অর্থের এই আপেক্ষিকতা সত্ত্বেও প্রতীক প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা কতগুলি নীতি অনুসরণ করতে পারি। প্রথমত, কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই প্রয়োগ যেন অনবধানতার ফলে বিচ্যুত ও পরস্পরবিরোধী হয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে। শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে সেজন্যেই বিশেষ সচেতনতা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রয়োগরীতি সর্বজনগ্রাহ্য বলে আমরা বিশ্বাস করি, সেই গোষ্ঠীতে আমাদের সেই রীতিকেই অনুসরণ করা উচিত। যদি কোনো প্রয়োজনে আমরা সচেতনভাবে এর ব্যতিক্রম করি তবে এই ব্যতিক্রমের প্রয়োজন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রোতা বা পাঠককে প্রথমেই অবহিত করা উচিত।

এই নীতি স্বীকার করার পরে অর্থবিশ্লেষণ সম্বন্ধে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। প্রথমত, অর্থের ব্যবহারিক ভিত্তির কথা স্মরণ করে প্রতীকের কোনো তথাকথিত "আসল" অর্থ অন্বেষণ থেকে নিরস্ত থাকলে তত্ত্ব আলোচনার অনেক বিভ্রান্তি কমবে। ব্যবহারিক প্রয়োগের পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা প্রস্তাব করতে পারি, কিন্তু কোনো মৌলিক অর্থের দোহাই দিয়ে কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগকেই আমরা বাতিল বা উপেক্ষা করতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, অর্থনির্ধারণের চেষ্টায়, অর্থাৎ যাবতীয় তত্ত্ব আলোচনায়, এই প্রয়োগরীতির বিশ্লেষণই প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য। যদি কেউ জানতে চায় আকাশ অর্থ কী, তবে তাকে এই শব্দপ্রতীকের যাবতীয় ব্যবহার বিশ্লেষণ করে জানতে হবে কী কী বিভিন্ন অর্থে এই প্রতীক প্রয়োগ করা হয়। এই বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে যদি কোনো সাধারণ ক্ষেত্র থাকে তবে একমাত্র তাকেই মূল অর্থ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। সাধারণ ক্ষেত্র খুঁজে না পাওয়া গেলে মূল বা কেন্দ্রীয় অর্থ নির্ধারণের আর কোনো উপায় নেই।

২

ভাষা ও অর্থ নিয়ে এই আলোচনার হেতু এই যে অন্যান্য তত্ত্ববিচারের মতো শিল্পতত্ত্বের আলোচনায়-ও প্রতীকপ্রয়োগ নিয়েই প্রাথমিক ও প্রধান সমস্যা। শিল্পতত্ত্ব নিয়ে এযাবৎ যতো দীর্ঘ ও জটিল তর্ক হয়েছে তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভাষার অর্থ সম্বন্ধে বোঝাপড়ার অভাবেই তর্কের মীমাংসা কঠিন হয়েছে।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে শিল্পতত্ত্ব বলতে আমরা কী বুঝি। ইংরেজিতে আর্ট এবং এস্‌থেটিক্স্ দুটি সাধারণত যে অর্থে ব্যবহৃত হয় ঠিক সেই ব্যবহারিক অর্থসমন্বিত বাংলা শব্দ আপাতত নেই বলেই মনে হয়। শিল্প কথাটার চাইতে আর্টের অর্থ আরো ব্যাপক। এই ব্যাপক অর্থের প্রতীক হিসেবে আর্ট কথাটাই বাংলায় চালু হয়ে গেছে। তবুও, যেই অর্থে এস্‌থেটিক্স্ আর্টের তত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব কথাটিকে আমি সেই অর্থেই ব্যবহার করছি। অবশ্য, এস্‌থেটিক্সের অন্যান্য বিশেষীকৃত অর্থ কোনো কোনো মহলে স্বীকৃত—যেমন, সৌন্দর্যতত্ত্ব। সৌন্দর্যের সংগে আর্টের যোগাযোগ কী সে কথা বিচার না করে, এস্‌থেটিক্স্ কথাটিকে আমরা একসংগে উভয় অর্থে ব্যবহার করতে চাই না। প্রথমত আমরা

আর্টের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি এবং আর্টের শাস্ত্রকে বলছি এস্থেটিক্স্—বাংলায় শিল্পতত্ত্ব। এই সাধারণ প্রতীকপ্রয়োগ গ্রহণ করে আমাদের আলোচনা সুরু।

এই প্রতীকপ্রয়োগ গ্রহণ করা হোক, এটা অবশ্য আমার প্রস্তাব। যেহেতু আর্ট কথাটা বাংলায় চালু হয়ে গেছে এবং যেহেতু ঠিক সমার্থক কোনো শব্দ আমাদের নেই, সেই হেতু এই শব্দের ব্যবহারে আমাদের আপত্তির কারণ দেখি না। প্রায়-সমার্থক শব্দের মধ্যে শিল্প বা কলা-র উল্লেখ করা যেতে পারে। আর্টের আলোচনায় আমরা সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করি, কিন্তু শিল্প কথাটাকে দৃশ্যমান এবং দর্শন-নির্ভর বস্তুর ক্ষেত্রেই সাধারণত প্রয়োগ করি। কলা শব্দের প্রয়োগ ব্যাপকতর, কিন্তু আর্টের গুণ-সূচক অর্থাংশের দ্যোতক নয়, অন্তত আধুনিক বাংলায় নয়। আর্ট যেই অর্থে যাবতীয় আর্টবস্তুর গুণের নির্যাস, রস শব্দটা সেই অর্থে তুলনীয়। কিন্তু আর্টের বস্তুগ্রাহ্য দিকটা সেখানে নেই।

এস্থেটিক্স্‌কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি বলা হয়েছে। কিন্তু এই সব প্রতীক সম্বন্ধে আমার আপত্তি এই যে এদের ব্যবহারে আর্টবস্তু বা আর্টের অভিজ্ঞতার কোনো একক বা প্রধান গুণ সম্বন্ধে প্রাক্-বিশ্লেষণ স্বীকৃতি করে নেয়া হয়। যা আনন্দ দেয় বা যাকে আমরা সুন্দর বলি সেই সব যাবতীয় বস্তুই কি আর্টপদবাচ্য? শুধু তাই নয়। কোনো নির্বস্তুক গুণ বা কোনো ভাব-সত্তাকে আর্টের আলোচনায় প্রাথমিক স্বীকৃতি বলে গ্রহণ করলে আর্টের বস্তুগ্রাহ্য বা অভিজ্ঞতা-নির্ভর দিকটা উপেক্ষা করা হয়। ভাববাদী চিন্তার প্রভাবে রসতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব ইত্যাদি শব্দ এমন সব যুক্তিবিমূঢ় ধোঁয়াটে আলোচনার সৃষ্টি করেছে যে বুদ্ধিগ্রাহ্য আলোচনায় এদের সংস্পর্শ নিরাপদ নয়। শিল্পতত্ত্ব কথাটা অনেক বেশি বস্তুনির্ভর, শিল্পবস্তুর সঙ্গে এর যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। সে জন্যেই, আর্টের ব্যবহারিক অর্থ শিল্পের চাইতে ব্যাপক হলেও, আমার প্রস্তাব আর্টের শাস্ত্রকে বলা হোক শিল্পতত্ত্ব। শিল্পকে যদি আর্টের মতো ব্যাপক অর্থে সর্বস্বীকৃতভাবে ব্যবহার করা হয় তবে সুবিধেই হবে।

৩

আর্ট শব্দের প্রয়োগ অবশ্যই স্থানবিশেষে বিভিন্ন। সবচেয়ে ব্যাপক অর্থে, আর্টকে বলা যেতে পারে কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার বিদ্যা বা কৌশল। শুধু ছবি আঁকা বা কবিতা লেখা-ই নয়; রান্না করা, খোঁপা বাঁধা, এমনকি বেঁচে থাকা—কোনো কিছু ভালো করে করতে পারা-ই এই অর্থে আর্ট। কিন্তু আর্টতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় কতগুলি বিশেষ কাজ করতে পারার বিদ্যার কথাই আমরা মনে করি। প্রধানত—ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, বিশেষভাবে দেখবার মতো বাড়ি বানানো, নাচ, গান, কবিতা-গল্প-উপন্যাস লেখা, অভিনয় ইত্যাদি।

এসব বিদ্যায় পারদর্শিতা যেমন আর্ট, আর্টের আর এক অর্থ এই বিদ্যার ফল বা সৃষ্টি। এই পারদর্শিতার দ্বারা সৃষ্ট যে বস্তু—যাকে বলা যেতে পারে আর্টবস্তু (work of art)—আর্ট শব্দটি দিয়ে সেই বস্তু বা বস্তুসমষ্টিকেও অভিহিত করা হয়। যেমন, মুঘল আর্ট বা গথিক আর্ট। অবশ্য এরকম ব্যবহারে বস্তু এবং বস্তুর বিশিষ্টতা, উভয়কে নিয়েই প্রতীকের সাধারণ অর্থ।

তৃতীয়ত—এবং আর্টতত্ত্ব আলোচনায় এই প্রধান অর্থ বলে গৃহীত—আর্টের অর্থ এমন

কোনো প্রকৃতিগত গুণ বা গুণাবলী যা বিভিন্ন আর্টবস্তুতে বর্তমান এবং যা অন্য কোনো বস্তুতে নেই। অর্থাৎ, বিভিন্ন আর্টবস্তুর যা সাধারণ ক্ষেত্র (common ground) তাই আর্ট।

মনে হয়, সাধারণত আর্টের আলোচনায় এই ত্রিবিধ অর্থ-ই মিশে থাকে। এর মধ্যে যে অংশকে নিয়ে আমরা বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং অভিজ্ঞতা-নির্ভর বিচার সুরু করতে পারি সে হোলো আর্ট-বস্তু। রং দিয়ে তৈরী ছবি, বা শব্দ দিয়ে তৈরী কবিতা।

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আর দুই বস্তু আছে এই বিচারের ক্ষেত্রে। প্রথমত যে মানুষ আর্ট-বস্তু নির্মাণ করে এবং দ্বিতীয়ত যে মানুষ সে বস্তু উপভোগ করে। স্রষ্টা ও উপভোক্তা—এই দুই ব্যক্তির দিক থেকেই আর্ট-বস্তুকে দেখা যেতে পারে। যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের অন্য কোনো পথ নেই। যেহেতু উপভোক্তা-ই বেশি এবং যেহেতু প্রধানত তাদের জন্যই আর্টবস্তুর অস্তিত্ব, সেই হেতু তাদের দিক থেকেই বেশি আলোচনা।

এভাবে বিচার করলে শিল্পতত্ত্বের জটিলতা বিস্ময়কর মনে হতে পারে। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত শিল্পতত্ত্ব নিয়ে এত সংবিরোধী এবং পরস্পরবিরোধী আলোচনা হয়েছে যে তার সাহায্যে আর্টের স্বরূপ নিয়ে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব মনে হয়। অথচ এই আলোচনার মধ্যে সিদ্ধান্তের অভাব নেই; শেষ সিদ্ধান্ত প্রচার করার উৎসাহ শিল্পতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিশেষ প্রবল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত থেকেই আলোচনা সুরু, বিশ্লেষণ থেকে নয়।

৪

আর্টের স্বরূপ নিয়ে এতাবৎ যত মত প্রচারিত হয়েছে তার মধ্যে দুটি প্রধান ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রথমত, প্রতীক-প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতন স্বচ্ছতার অভাব। তত্ত্বমূলক আলোচনায় আমরা অনেক সময় এমন সব শব্দ ব্যবহার করি যাদের বস্তু বা ভাব-সত্তার রূপ আমাদের নিজেদের মনেও স্পষ্ট নয়। এই সব শব্দ-সংকুল পথে যুক্তিনিষ্ঠ বিচারের অগ্রগতি কঠিন। কাব্যরসের আস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর হতে পারে, কিন্তু যেহেতু রস এবং ব্রহ্ম উভয়ই অনির্বচনীয় সেই হেতু এদের সম্বন্ধে বুদ্ধিগ্রাহ্য আলোচনা অসম্ভব। শিল্পতত্ত্বের প্রথাসিদ্ধ আলোচনায় সৌন্দর্যকেও আমরা ঠিক এমনি এক অনৈসর্গিক, অলৌকিক সত্তা বলে গ্রহণ করেছি।

এই জাতীয় প্রতীকের প্রয়োগকে উপহাস করা আমার অভিপ্রায় নয়। আমার বক্তব্য শুধু এই যে আলোচনাকে যদি আমরা জ্ঞানের বা বোধের সহায়ক করতে চাই তবে আলোচনা-কারীদের মধ্যে প্রতীকের ব্যবহারিক অর্থ সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট বোঝাপড়া থাকা দরকার। কিন্তু যে প্রতীকের অর্থ প্রয়োগকর্তার কাছেও সুনির্দিষ্ট নয়, অপরের কাছে তার অর্থ কী ভাবে স্পষ্ট হতে পারে?

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে তত্ত্বমূলক আলোচনায় অস্পষ্টতার সম্ভাবনা বেশি। কারণ এই আলোচনায় প্রতীক ও প্রতীকধারীর সম্পর্ক বেশিরভাগ সময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের দ্বারা নির্দিষ্ট নয়।

প্রতীকধারীদের প্রধানত চার ভাগ করা যায় : (১) নৈসর্গিক বস্তু (natural objects or spatio-temporal particulars); (২) বস্তুর ক্রিয়া বা ক্রিয়াধর্ম (functions of

such objects); (৩) বস্তুর গুণ (qualities of such objects); (৪) নির্বস্তুক গুণ (non-natural qualities or values)।[১] প্রথম তিনটিকে আমি ইতিপূর্বে প্রতীকের বস্তুসত্তা বলে উল্লেখ করেছি, চতুর্থটিকে বলেছি ভাবসত্তা। ভাব এখানে idea নয়, value বা মূল্য।

Fact (বস্তুসত্য) ও value (মূল্যসত্য)-র তফাত দর্শনের গোড়ার কথা। বস্তুসত্য আমাদের চেতনা-নিরপেক্ষ, কিন্তু চেতনা-জাত মূল্যবোধ ছাড়া মূল্যসত্যের অস্তিত্ব নেই। ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর—এসব বস্তুগুণ নয়, বক্তার মূল্যবোধের প্রকাশ।

যেহেতু মূল্যসত্যের অস্তিত্ব ব্যক্তিগত মূল্যবোধে এবং যেহেতু মূল্যবোধ প্রায়শই ব্যক্তি-বিশেষে পৃথক সেই হেতু মূল্যপ্রতীক বা ভাবপ্রতীকের (value-symbols) অর্থ বস্তু-প্রতীকের (fact-symbols) অর্থের তুলনায় অস্পষ্ট ও অনির্দেশ্য। শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় আমরা যতই না কেন বস্তুপ্রতীকের বিশ্লেষণ করি, শেষ পর্যন্ত মূল্যবিচারে আসতেই হবে। অধুনা অবশ্য মূল্যবোধকেও বস্তুনির্ভর মনস্তত্ত্ব দিয়ে সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ এখনো নৈসর্গিক বিজ্ঞানবিচারের মতো নির্ভরযোগ্য নয়। কাজেই শিল্পতত্ত্বে নির্বস্তুক প্রতীক এড়ানো সম্ভব নয়। অনেক আধুনিক শিল্পতাত্ত্বিক beauty বা aesthetic quality জাতীয় ভাবপ্রতীক সযত্নে পরিহার করে চলেন। কিন্তু সমস্যা তাতে মেটেনি। Interinanimation of impulses বা auditory imagination জাতীয় অধুনা-প্রচলিত শব্দের বস্তুসত্তা-ও খুব স্পষ্ট নয়। সম্প্রতি এক পণ্ডিত বলেছেন এস্‌থেটিক গুণ বলে কোনো কিছু নেই, কিন্তু এস্‌থেটিক দৃষ্টিভংগী বলে একটা কিছু থাকতে পারে। এতে অর্থবোধের বিশেষ কিছু সাহায্য হোলো বলে মনে হয় না।

শিল্পতত্ত্বে অর্থের কথঞ্চিৎ অস্বচ্ছতা অবশ্যম্ভাবী এ কথা স্বীকার করেও প্রচলিত ভাববাদী মতামতের অস্পষ্টতা সমর্থন করা যায় না। এই অস্বচ্ছতার পরিমাণ আমরা অনেক কমিয়ে আনতে পারি, এর ক্ষেত্র অনেক সংকোচিত করা যেতে পারে, যদি আমরা শব্দ-প্রয়োগ সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হই। ভাববাদী শিল্পতত্ত্বে প্রথম থেকেই সৌন্দর্য, রস ইত্যাদি কতগুলি মূল্যসত্যকে স্বীকার করে নেয়া হয়। তার পরে যে আলোচনা হয় তাতে আর বিশ্লেষণের অবকাশ থাকে না—তখন একমাত্র কাজ আরো সব নির্বস্তুক শব্দপ্রতীকের জাল বুনে বক্তব্যের অভাব বা অস্পষ্টতা লুকিয়ে রাখা। কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে যে সব বস্তুসত্য আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে তাদের প্রকৃতি ও সম্বন্ধ বিশ্লেষণ যদি আমাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হয় তবে আলোচনা অন্তত অনেকদূর পর্যন্ত যুক্তির সোজা পথে চলতে পারে। বস্তুর অভিজ্ঞতা থেকেই মূল্যবোধে আসা উচিত, প্রাক্‌-স্বীকৃত মূল্যসত্তা থেকে বস্তুর প্রকৃতি নির্ধারণ অসম্ভব।

প্রচলিত শিল্পতত্ত্বের দ্বিতীয় ত্রুটি বস্তুসত্যের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা। বিভিন্ন আর্টের অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন বস্তুসত্যের সংগে আমাদের পরিচয়। এই বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে আর্টের কোনো সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণ কঠিন। অথচ কোনো শিল্পতাত্ত্বিক-ই একটা সাধারণ সংজ্ঞায় না এসে নিশ্চিন্ত বোধ করেন না। ফলে, এই সব সংজ্ঞায় বিভিন্ন বস্তুসত্যকে উপেক্ষা করা হয়। যে তাত্ত্বিক প্রধানত সাহিত্যের পণ্ডিত বা রসিক তিনি হয়তো সংগীত বা চিত্র-

[১] অন্যান্য প্রতীকধারীদের মধ্যে গাণিতিক সত্তা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, তিন কথাটা কিসের প্রতীক? ('বাংলাভাষা পরিচয়' পৃঃ ১৪-১৫)। Wittgenstein তাঁর *Philosophical Investigations* এই আলোচনা দিয়েই সুরু করেছেন।

কলার অভিজ্ঞতার অনেক সত্যকে উপেক্ষা করেন, তেমনি চিত্রশিল্পবিশারদদের সংজ্ঞায় হয়তো নৃত্য বা অভিনয়ের বস্তুসত্য চাপা পড়ে। অথচ প্রত্যেকেই আর্ট বলতে বোঝেন যাবতীয় আর্টবস্তুর সাধারণ প্রকৃতি বা গুণ। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য যাবতীয় আর্টের সত্য-নির্যাস।

৫

আর্ট নামধারী বিভিন্ন সৃষ্টি বা বিদ্যার কথা স্মরণ করে অনেকে তাই বলেন যে আর্ট বলে এমন কোনো জিনিষ নেই যা বিভিন্ন আর্টের মূল বা সাধারণ ক্ষেত্র। সংগীত, চিত্রকলা, কাব্য প্রভৃতি বিভিন্ন আর্ট আছে, কিন্তু এদের মধ্যে এমন কোন প্রকৃতিগত যোগসূত্র নেই যা থেকে আর্টের শাস্ত্র বা তত্ত্ব বলে কোনো জিনিষ গড়ে উঠতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন যে বিভিন্ন জিনিষকে একই নামে অভিহিত করা হয় বলেই তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অক্সফোর্ডের দর্শনের অধ্যাপক গিলবার্ট রাইল উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, কোনো শিশু মনে করতে পারে যে ম্যাক্‌ট্যাভিশ্‌ নামধারী পৃথিবীর যাবতীয় লোক পাশের বাড়ীর ম্যাক্‌ট্যাভিশ্‌দের আত্মীয়। উইটগেনস্টাইন একে উপহাস করে বলেছেন, "the craving for generality"।

কিন্তু একটু বিচার করলেই দেখা যাবে যে এই ধরনের উক্তির মধ্যে পরিহাস যতটা আছে যুক্তি ততটা নেই। ম্যাক্‌ট্যাভিশ্‌ যে ধরনের প্রতীক, আর্ট কি সেই ধরনের প্রতীক? একটা ব্যক্তিপ্রতীক, আর একটা গোষ্ঠীপ্রতীক। ব্যক্তির নামও যে গোষ্ঠীর পরিচায়ক হতে পারে এতো আমাদের দেশের অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। একাধিক ব্যক্তিপ্রতীক একরকমের হলে প্রতীকধারীদের মধ্যে কোন গোষ্ঠী-সম্পর্ক থাকতে-ই হবে এমন কথা অবশ্য নেই, কিন্তু সে সম্পর্ক বা সম্পর্কের অভাব তো প্রতীকের ব্যবহারেই নির্ধারিত।

আর্ট প্রতীকের ব্যবহারে আমরা সমগুণবিশিষ্ট বস্তুসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেই বলেই আর্ট গোষ্ঠীপ্রতীক। এই বস্তুসত্তার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যে সাধারণক্ষেত্রের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাসী সে বিশ্বাস অমূলক কিনা সে কথার বিচার একমাত্র বিভিন্ন আর্টবস্তুর বিশ্লেষণ থেকেই হতে পারে। আর এই বিশ্বাস অমূলক প্রমাণিত হলে বিশ্বাসের উৎপত্তি এবং এতকাল ধরে এর প্রচলন সম্বন্ধেও সন্তোষজনক কারণ দেখাতে হবে।

এ সম্বন্ধে অধ্যাপক রিচার্ডসের সঙ্গে আমার সামান্য পত্রালাপের সুযোগ হয়েছিল। রিচার্ডস বিশিষ্ট শিল্পতাত্ত্বিক, ভাষার অর্থ নিয়েও তাঁর বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য; কাজেই, এই পত্রালাপ থেকে কিছু উধৃতি অপ্রাসংগিক হবে না বিশ্বাস করি।

রিচার্ডস লিখেছিলেন: "The little I have written on aesthetics has all been an endeavour to show that there is no such subject: that it is generated by linguistic over-simplification!"

এর উত্তরে আমার বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে: If there is no such subject as aesthetics, what is that on which you have written while writing on aesthetics? If you mean that what you have written on is what is known as aesthetics, is not there a subject called aesthetics? Or, do you mean that although there is a subject-name there is no *real* subject-matter? How can discussion on an *un-real* subject have

real significance? . . . . . I have used the word aesthetics to mean the subject of what are known as works of art . . . . . whether there is any common ground in the different arts is itself my main enquiry. . . . . If there is no such common ground, why have you always discussed the different arts at least seemingly as part of one subject? Why, for example, in writing on literary criticism, have you discussed the appreciation of music and painting and not the appreciation of, say, sausages? You yourself seem to have assumed a special relationship or at least the notion of such a relationship."

রিচার্ডসের পরের চিঠি সংক্ষিপ্ত : আমার প্রশ্নের কোনো যথাযথ উত্তর তাতে পাইনি। উনি লেখেন : 'If you name all the varied concerns men may have with poetry, sculpture, scenery etc. 'Aesthetics', there is, of course, a subject, or a variety of subjects so named ; but I had in mind the traditional definitions of aesthetics . . . . . ."

এই পত্রালাপ থেকে আমার এ ধারণা আরো দৃঢ় হয়েছে যাঁরা আধুনিক অর্থতাত্ত্বিক বিচার-পদ্ধতিতে আর্ট বা এস্‌থেটিক্সের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাঁরাও তাঁদের অস্বীকৃতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অথবা ফলাফল বিশ্লেষণ করতে নারাজ। প্রচলিত মতামতের ভ্রান্তিনিদর্শনে এঁদের বিচার যত কার্যকরী হয়েছে, মূল বিষয়ের বিশ্লেষণ বা অর্থান্বেষণে ততটা সহায়ক হয়নি।

৬

মূল প্রশ্ন, বিভিন্ন আর্টবস্তুর মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত সাধারণক্ষেত্র আছে কিনা ; এবং যদি থাকে, তা কী? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণে প্রথম কাজ আর্টবস্তু বলে কোন কোন ধরনের জিনিষ অভিহিত তা স্থির করা। দ্বিতীয় কাজ, এই বিভিন্নবস্তুর প্রকৃতি নির্ধারণ। আর্টকে বলা হয়েছে সৃষ্টি। কী সৃষ্টি করা হয়? বস্তু? অভিনয় বা নৃত্যে সৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতি কী? চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ইত্যাদি অধিকতর বস্তুগ্রাহ্য আর্টেও বা শিল্পীর দ্বারা সৃষ্ট কোন জিনিষ? রং-ও নয়, ক্যানভাস-ও নয়, পাথর-ও নয়। যদি বলি এই সব জিনিষের প্রয়োগে কোন বিশেষ রূপ, তাহলে প্রশ্ন হবে রূপ ছাড়া কোনো বস্তুকেই কি আমরা কল্পনা করতে পারি? কী সে রূপ যা শিল্পীরই বিশেষ সৃষ্টি? তৃতীয়ত, বিভিন্ন আর্টবস্তুর অভিজ্ঞতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ। এই অভিজ্ঞতার সাধারণক্ষেত্র যদি হয় আনন্দ বা সৌন্দর্যানুভূতি তবে এই মূল্যবোধের প্রকৃতি আরো নির্দিষ্ট করতে হবে। পিলু ঠুংরী আর Oedipus Rex—কী মূল্যবোধে এ উভয়ই সুন্দর বা আনন্দদায়ক? তাহলে আনন্দ বা সৌন্দর্যের কী সংজ্ঞা আমরা শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় গ্রহণ করবো? চতুর্থ কাজ, এই তুলনা-মূলক বিশ্লেষণের ফলাফল বিবৃতি।

এই বিচার-পদ্ধতির একমাত্র অবলম্বন যুক্তি ও বস্তুসত্যনির্ভরতা। যদি কোনো বস্তুসত্য সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রতিবন্ধক হয় তবে তাকে উপেক্ষা করা মারাত্মক। অভিজ্ঞতা

যদি সিদ্ধান্তকে বাধা দেয় তবে সে বাধা স্বীকার করে নেয়াই ভালো ; এবং যতক্ষণ না সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাদ্বারা সমর্থিত অপর কোনো সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় ততক্ষণ সাধারণক্ষেত্র সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত প্রচারের চেষ্টা না করাই ভালো। এই অসাফল্য-ই ভবিষ্যতে নতুন বিশ্লেষণকে সাহায্য করবে। বস্তুসত্যবিমুখ বিচারের আপাতসফল সিদ্ধান্ত এ পর্যন্ত আর্টবস্তু এবং আর্টের প্রকৃতিকে বিশেষ অস্পষ্ট করে রেখেছে।

শিল্পতত্ত্বে কী ধরনের প্রশ্ন যুক্তি বা অভিজ্ঞতার বিচারে প্রাসংগিক এবং কী ধরনের প্রশ্ন নিয়ে ফলবতী আলোচনা সম্ভব তার যে ইংগিত এখানে দেয়া হলো তাতে শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তুর সীমারেখা নির্ধারিত হতে পারে। আর এক ধরনের প্রশ্ন আছে। যথা, সৌন্দর্য বা শিল্পরসের স্বরূপ কী, ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস এই সব প্রশ্ন নিয়ে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ফলপ্রসূ আলোচনা সম্ভব নয়। কারণ এ সব প্রশ্নের প্রাক্-স্বীকৃত অনির্দেশ্য মূল্যবোধ।

আর্টবস্তু যেহেতু মানুষের সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তার দিক থেকে আর্টের বিচার-ও শিল্পতত্ত্বের বিষয়ীভূত। কিন্তু এই বিচার পৃথকভাবে করা উচিত। সংজ্ঞা নির্ধারণে অবশ্য দুই বিচারের ফলাফলই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিচারের সময় দুটি দিককে আলাদা না রাখলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা। তা ছাড়া সৃষ্টি সম্পূর্ণ হবার পরেই যখন আর্ট, সৃষ্ট বস্তুর অভিজ্ঞতা-ই যখন আর্টের অভিজ্ঞতা এবং শিল্পতাত্ত্বিকের পক্ষে যখন (তিনি নিজে যদি শিল্পী না হন) সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে অপরের বিবৃতির ওপর নির্ভর না করে উপায় নেই, উপভোক্তার দিক থেকে আর্টবস্তুর প্রকৃতি বিচারই শিল্পতত্ত্বের প্রধান বিষয়বস্তু।

নটি

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

এক'শ কুড়ি বছর আগেকার কথা। গোয়ালিয়ার সহরের রাজপথে রংবাহারী মিছিল বেরিয়েছে।

হাতী, ঘোড়া ও উটের পায়ের ধুলোয় সমাচ্ছন্ন গোয়ালিয়ারের রাস্তা। দোকানের আলোগুলো সেই মিহি মসলিনের আড়ালে চোখে পড়ছে আবছা হয়ে, অজস্র চুমকিদার বুটির মত।

জনস্রোতের পাশ দিয়ে দিয়ে বাঁক করে ঝকঝকে পিতলের কলসীতে দুধ, আর ঘি নিয়ে চলেছে গুজরী মেয়েরা।

তরমুজ-বিক্রেতা সবুজ তরমুজের গায়ে ছুরি চালিয়ে আধখানা করে তুলে ধরে চেঁচাচ্ছে, এ-রকম তরমুজ নাকি জীবনে কেউ দেখেনি। পেয়ারার টুকরি মাথায় মুসলমান বিক্রেতা হেঁকে যাচ্ছে—আমরুদ! আমরুদ!

সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে থেকে থেকে রব উঠছে—তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! যাত্রীরা আসছে।

ভীলসা হয়ে, শিপ্‌রী হয়ে, ঢোলপুরের পথে, আগ্রা থেকে দলে দলে মানুষ আসছে গোয়ালিয়ারে।

তানসেনের সম্বাৎসরিক উর্স'। সেই দিনে তাঁর সমাধি-প্রাঙ্গণে বিরাট জল্‌সা হবে। গায়ক গায়িকারা ঊষার প্রথম প্রহরে সঙ্গীতগুরুর সমাধিতে এসে শ্রদ্ধা জানাবেন, তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে সাধনা যেন সার্থক হয় ভক্তের।

হাতীর পিঠে হাওদা চড়িয়ে আসছেন রাজরাজড়ার সভাগায়করা। তাঞ্জামে, পালকি ও মেনায় আসছেন কাশী, লক্ষ্ণৌ, ফিরোজপুর, ঢোলপুর, রামনগর, আগ্রার সুন্দরী শীষমহল-ওয়ালীরা। কেউ গানের জন্য বিখ্যাত, কারো কালো চোখের বাঁকা চাহনি আর নৃত্যপরা ঘুঙুর-বাঁধা পায়ের তালে কোন নবাব কয়েদ হয়ে আছেন, কেউ বা শুধু রূপসী বলেই খ্যাত, তাঁর হাতের ঢালা সরাব না পেলে কাশীর বড় বড় ঘরাণার ছেলেদের সন্ধ্যাটাই মিথ্যে হয়ে যায়। পাঁচিল-ঘেরা মস্ত আঙিনায় মিঞা তানসেন ও গুরু মহম্মদ ঘৌসের সমাধি এক পাশে। আজ সন্ধ্যায় আলোয় ঝলমল করছে তানসেনের মকবরা।

মাটিতে মস্ত দু'টো মশাল পুঁতে সামনে দাঁড়িয়ে খবরদারী করছেন সিন্ধিয়া দফ্‌তরের কোন কর্মচারী। উর্স'-এ এসে সকলে যাতে গহনাগাঁটি টাকাপত্র সাবধানে রাখেন সেজন্য তারস্বরে মিনতি জানিয়ে চলেছেন।

লাল রেশমের টোপ লাগানো বড় বড় তাঁবু পড়েছে এক পাশে। তাঁবু পড়েছে পাঁচিলের বাইরেও। সেখানে দাসদাসীরা এসে ছুটোছুটি করে; গরমজল, গরমদুধ যোগাড় করছে মনিবদের পথশ্রমের ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে।

মনিব মনিবে দেখা হ'লে ঘন-ঘন 'রহিম রহিম! রাম রহিম! রাম রাম!' শোনা যাচ্ছে। এক মনিব কানের হীরেতে ঝিলিক দিয়ে অন্য জনকে শুধোচ্ছেন,—খাঁ সাহেব এবার রাগাহিন্দোল নিয়ে ফয়সালাটা হয়ে যাবে না কি? সে মনিবও অনামনে গলার সাচ্চা মুক্তোর

মালাটা তস্‌বীর মত ঘোরাচ্ছেন, আর বলছেন, কেন নয় মিশিরজী! তবে কি না—হায়দারাবাদে চলে যেতে হচ্ছে কিনা রাণা সাহেবের সঙ্গে।

দু'জনে দু'জনকে টক্কর নিচ্ছেন আর শিকারীর মত গোঁফের আড়ে আড়ে হাসছেন।

কোন তাঁবুতে মান করে বসেছেন কোন অভিমানিনী। বিব্রত শেঠ, করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মান দুস্তর—গত বছর আর এ বছর একই হীরের গহনা পরে তিনি গাইতে পারবেন না—কাশীর কমল যখন বছর বছর নতুন গহনা পরে আসছে।

শেঠ সাহেব মিনতি করে বলছেন—দেবী যদি প্রসন্ন হন, তবে তিনি নিবেদন করতে পারেন যে, বিজাপুরের শ্রেষ্ঠ মণিকার অম্বলচাঁদ, এবার আসল হীরে-পান্নার এক প্রস্ত গহনা নিয়ে এসেছে—শুধু কেনবার অপেক্ষা।

কোন কোন তাঁবুতে, ধূপের ধোঁয়া উঠছে মৃদু মৃদু। বিলম্বিত বেণী, শুভ্র স্বচ্ছ থান পরিহিতা মালকিন বীণা কোলে বসে মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিচ্ছেন, আর—

মুরলিয়া নাহি বোল শ্যাম নাম—

এই কথাগুলির ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করছে রাগিণীপটমঞ্জরী। মনে হচ্ছে সমস্ত রজনী সাধনা করলে হয় তো প্রসন্না রাগিণী রূপ পরিগ্রহ করবেন সাধিকার ধ্যানে—

কান্তবিরহে শীর্ণা, উজ্জ্বল কাঞ্চনবর্ণা, প্রিয়বিরহে অধীরা পটমঞ্জরী হয়ত আশীর্বাদ করবেন তাঁকে।

আবার কোন তাঁবু থেকে টুকরো টুকরো গানের বোলি ছড়িয়ে পড়ছে ফুলঝুরির মত। গায়কের রেশমের জামা ঘামে ভিজে গেছে, মুখে হাসি, আঙুলের আংটি থেকে আলো ঝিলিক দিচ্ছে, মুক্তোর মালা ওঠানামা করছে—সারেঙ্গী ও তবলা সঙ্গতকার মুগ্ধ হয়ে তারিফ দিচ্ছেন থেকে থেকে। কুশলী গায়ক, সুর ও কথাকে অবহেলে তালে তালে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন কখনো, আবার নতুন কৌশলে তাকে ধরছেন।

চন্দেরী শাড়ী, হীরামোতি, গালিচা, চন্দনকাঠের আসবাব—এই সব নিয়ে আনাগোনা করছে বানিয়ারা বড় বড় তাঁবুর সামনে, গত বছর প্রসন্ন ছিলেন বাইজীসাহেবা, কয় হাজার টাকার বিক্রী হয়েছিল। এবার যদি একবার নজর করেন তবে কিছু আসল জিনিষ দেখাতে পারেন তাঁরা।

এই জমজমাট ছেড়ে ওদিকেও কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। তার অধিবাসিনীদের—বেশ দীন হীন, চেহারা মলিন, সুখস্মৃতি যা সবই অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ তাদের কাছে একই রকম আঁধার।

কাশী, ফিরোজপুর, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রাতে একদা তাদের নাম ছিল। শেঠ ও নবাব বাড়ীতে তারা বাঁধা ছিল। নবীন যৌবন মালিকের টাকার বিনিময়ে তারা মুজরো করত শীষ ঘরে বসে, নাচত, গাইত, সরাব ঢালত কাঁচের পেয়ালায় আর মিঠে মিঠে কাজলাদিঠি ছুঁড়ে দিত। যৌবন ফুরিয়ে গেলে, বা মালিকের মর্জি বদলালে তাদের দিন ফুরিয়ে যেত। তখন ভাঙা নৌকোর মত, ঘাট খুঁজে খুঁজে ফিরত তারা। এই ছিল তাদের নসীব। যে নসীব নাকি দুনিয়ার মালিকও বদলাতে পারেন না।

বছরে বছরে তারাও তানসেনের উর্স-এ আসে। সম্রাটের সভার গায়ক মিঞা তানসেন, তাঁর নামেই যাদু আছে। গান ছিল তাঁর প্রাণ, আর প্রেম ছিল বিদ্যাস, সারা-জীবনে রাগরাগিণীরা মূর্তি পরিগ্রহ করেছে তাঁর ধ্যানে। ধ্যানভঙ্গে চকিতে সরে গেছে

তারা মরীচিকার মত। ধ্যানের জগতের মায়াময়ীকে বাস্তবে ধরতে পারেননি বলেই হয়ত তানসেনের ব্যক্তিগত প্রেমগুলিও ছিল খাপছাড়া, খেয়ালী আর দুর্বার। সঙ্গীতসাধকের গুরু তানসেন, তাঁর সমাধি তীর্থ। সেই তীর্থে বছর বছর এসে মেলে বিগতযৌবনা, হতভাগিনীরা। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে সসম্ভ্রম প্রণতি জানায়, আর সমাগতদের মনোরঞ্জনের প্রয়াসে এ তাঁবু থেকে সে তাঁবু ফেরে।

এমনি এক তাঁবুর ভেতরে ধুঁয়ো-ওঠা একটা বাতি জ্বলছে। তার মলিন ছায়ায় খড়ের বিছানায় শুয়ে আছে রোশান। শীর্ণ বাহু এলিয়ে পড়েছে। তিনজন সঙ্গিনী মৃদু স্বরে ফাতেহা পড়ছে, কোরাণের অমৃতবাণী শোনাচ্ছে মৃত্যুপথ-যাত্রিনীকে। রোশানের পাশে একমুঠো জুঁইফুলের মতো শুয়ে আছে মোতি। রোশানের দুই বছরের মেয়ে। এতখানি চরম দুর্ভাগ্যের ভালা তার মাথায়, তবু সে এমন নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় ঘুমুচ্ছে যে দেখলে মৃত্যুরও দয়া হবে। বৃদ্ধ হেকিম পাশে ব'সে আছেন টুল পেতে।

মৃত্যুর কোন ধারণা তখন রোশানের চেতনায় নেই। তার দুই চোখ জুড়ে এক তরুণ যুবকের সপ্রেম চাহনি—কানে বহুদূর থেকে পরিচিত কণ্ঠে কার আকুতি—

এক নজর দিখা যাতা তো তেরে কেয়া যাতা
য়ো গরীবোঁকে মজরোঁসে গুজারনে বালে—

দিল্লীর নাচওয়ালীদের মধ্যে রোশান ছিল অন্যতমা। তার রক্তে ছিল ভরা পূর্ণিমার সমুদ্রের আকুলতা। প্রেমের আহ্বানে দেওয়ানা হ'য়ে যৌবনে তার মা ঘর ছেড়েছিল। ফিরোজপুরের নবাবসাহেবের ঘরে তার মুজরো বাঁধা ছিল। অষ্টাদশ শতক পেরিয়ে সবে ঊনবিংশ শতকে পড়েছে সে যুগ। তখন রাজরাজড়া নবাববাদশাদের রাজত্ব। নাচনে-ওয়ালীদের তখন বড় কদর। সে যুগটারই রমরমা অন্যরকম। রাজপথে ঘোড়ার খুরের সঙ্গে টগ্‌বগ্‌ করে ওঠে জোয়ান রক্ত, তরোয়ালে তরোয়ালে, বর্শায় বর্শায় লড়াই লেগে যায়। গোলাপ চামেলী বেলীর গন্ধ-সুবাসিত সন্ধ্যা নামে, কাঁচের ঝাড়ে আলো ঝলমল করে—মখমলের তাকিয়া হেলান দিয়ে বিশ্রাম করে প্রান্তযৌবন সামন্ততন্ত্র, আর ঘুঙুরের রুনুঝুনুর সঙ্গে রঙীন পেসোয়াজে দোল খেলিয়ে মিঠে গলায় নিরুণ তোলে নাচওয়ালী—

তিরছি নজরেসে ময় কয়েদী বনী হুঁ—

সেই দিনের থেকে প্রাণরস আহরণ করে লতার মতো মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠল রোশান। যৌবনভারে ঈষৎ আনমিত হল দেহ, কালো চোখে অতল রহস্য নামল, প্রবালের মতো ওষ্ঠাধরের হাসিতে মিঠে সুর লাগল, রোশানের মা-কে সবাই বললো, এবার মেয়ের দৌলতে মা রাণী হয়ে যাবে।

কিন্তু অদৃশ্যে দেবতার হাতে ভাগ্যের পাশায় নতুন দান পড়ে। রোশানের জীবনে এল প্রেম।

সাতপুরুষের নাচওয়ালী, হৃদয় নিয়ে বেসাতি করা পেশা, কিন্তু রক্তে তার ছিল ভালবসে দেওয়ানা হবার আকুলতা। প্রেম এল দুর্বার হয়ে—সমুদ্রের মতো ভাসিয়ে নিল তাকে—অসহ বেদনা, অপূর্ব আনন্দে রক্ত-গোলাপের মত ফুটে উঠল রোশান একজনের মুখ চেয়ে। কিন্তু তার প্রেমিকের হৃদয় ছিল না।

ফিরোজপুরের তরুণ নবাব সামসুদ্দীন, সুপুরুষ, দুঃসাহসী, বে-পরোয়া। রোশানের সাথে তার প্রথম দেখা ভরা জলসায়। মা আর মেয়ে নাচের শেষে মোহর কুড়োতে

ব্যস্ত। সেই সময়ে কেমন করে যেন রোশানের নজর পড়েছিল তরুণ নবাবজাদার ওপরে, মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল রোশান।

দুরন্ত যৌবন। মাঝরাতে উটের গাড়ির পাশের থেকে রোশানকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন নবাব। বলেছিলেন,—তোমার প্রেমের কারাগারে আমি বন্দী—

এক নজর দিখা যাতা তো তেরা কেয়া যাতা
য়ো গরীবোঁকে মজরোঁসে গুজারনে বালে—

অস্ফুট চাঁদের আলোয় প্রেমাস্পদের আবেগ-টলমল চোখে যুগযুগান্তের কোন লায়লার স্বপ্নের চরিতার্থতা দেখেছিল রোশান। মনে হয়েছিল মরুতে মরুতে বালির উপরে এই মজনুকেই ডেকে ফিরেছে তার পিয়াসী মন। তাই নিশ্চিন্ত নির্ভরে ভৃঙ্গারের মত মুখ তুলে ধরেছিল সে—আর তাকে এক চুমুকে পান করেছিলেন সামসুদ্দীন।

বড়ী মা তাকে বারণ করেছিল, বলেছিল,—বেটি ভালবেসেই আমাদের জাত মরে, ওরা শুধু ভোমরার মত উড়ে চলে যায় অন্য বাগিচায়, অন্য ফুলে। কোনো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধলি না কেন বেটি, কেন ভুল করলি?

রোশান মায়ের কথা মানেনি। নর্তকীর প্রেমে আকুল আত্মসমর্পণের বাসনা—সব বিলিয়ে না দিলে তার তৃপ্তি নেই। রোশানের মনে হত চাঁদ অফুরান, গুলবাগিচার বুলবুলের গানও অফুরান—

কিন্তু একদিন রজনী প্রভাত হল। সহসা সামসুদ্দীন ত্যাগ করলেন সহর। একটি কথা বলবার ছিল রোশানের—একটি কথা বলতে সে ছুটে গেল। তার আগের দিনই চলে গেছেন নবাব। আগ্রায় নাকি এসেছে কাশ্মীরের গুল্—উনিশ বছরের উর্বশী।

এই জীবন এক পানপাত্র, নর্তকী তাতে সিরাজ। পিপাসিত এসে তাকে গ্রহণ করে, সার্থক হয় তার যৌবন। তৃষ্ণা মিটে গেলে, যদি দাম ফেলে দিয়ে চলে যায় তৃপ্তজন, তবে নতুন করে কাজল পরো, বেণীতে মোতির ফুল গাঁথ, হীরের ঝিলিক ঠিক্‌রে উঠুক কঙ্কণে, রেশমী গাঢ়ারার প্রান্তে জরিতে ঢেউ খেলে যাক। এই জীবনদর্শন মানতে চাইল না রোশানের মন। যৌবনের উন্মেষে মন আর প্রাণ নিঃশেষ করে নিয়েছে একজন, কখনো আকুল আবেগে মনে হয়েছে তারাই দু'জন লায়লা আর মজনু। মরুভূমিতে দুরন্ত যাযাবর জীবনের পটভূমিকায় যে প্রেম সার্থক হল না, যার বেদনা বুকে বয়ে কবি বার বার ছন্দে ছন্দে মৃত্যুহীন গান গাইল, সে প্রেম তাদেরই। সে-ই সেদিনের লায়লা আর সামসুদ্দীন তার প্রেমে পাগল হতভাগ্য মজনু। কখনো গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেছে। চোখের জলে উপাধান সিক্ত করে ভেবেছে তারাই দু'জন শিরী ফরহাদ্। তার চোখের জল পলকে মুছে নিয়ে প্রেমিক বলেছে,—তোমার গালের একটি তিলের জন্যে—। পৃথিবীর প্রথম অনুভূতি প্রেম। প্রেমের ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস। শুধু কি বিশ্বাস? প্রিয়জনকে সমস্ত গুণ আরোপ করে, তাকে সমস্ত ভালবাসা দিয়েও তৃপ্তি হয় না—এ-ও প্রেমেরই ধর্ম।

তাই রোশান অনুযোগ করল না। মায়ের সহস্র অভিযোগ মাথায় নিয়ে, সে তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়াল। দেখা করতে গিয়ে লাঞ্ছনা পেয়ে ফিরল। শিকার থেকে ফিরবার পথে, অপেক্ষমান রোশানকে দেখে ভ্রূকুটি করলেন সামসুদ্দীন। বললেন,—কে একে ঢুকতে দিয়েছে?

সেই রূঢ়কণ্ঠ রোশানের মর্মে গিয়ে বিঁধল। মুহূর্তে স্থানত্যাগ করল সে। ছি ছি সে কি ভিক্ষা করতে গিয়েছিল? দয়া চেয়েছিল? দীন ও মলিন বেশে তাকে দেখেই কি

লজ্জা পেলেন নবাব? ঘরে ফিরে এসে সে চিঠি লিখল। চিঠিখানি পাঠিয়ে দিয়ে সেই দিনই ফিরোজপুর ছেড়ে চলে গেল। নবাব খুলে দেখলেন—তাতে লেখা আছে,—তোমার প্রেম, হে প্রিয়, একদিন ভূষণ বলে মাথায় পরেছিলাম, আজ সেই প্রেমকে তুমি ফেলে দিয়েছ, কিন্তু আমি ত ফেলতে পারি না, তাই তাকে তিলক করে পরে ভিখারিণী হয়েছি—তাতে কি তোমার লজ্জা?

সেই রাতের স্মৃতি রোশানের চোখে বুঝি আবার ভেসে উঠল। একবার মনে হয়েছিল ঝাঁপিয়ে পড়বে যমুনার জলে। বর্ষায় যমুনা উত্তাল হয়ে কলকণ্ঠে হাত তুলে লক্ষ ঢেউয়ে নাচছে। সেই ঢেউয়ে বুঝি কার হাতছানি দেখেছিল রোশান। কিন্তু সে ত একা নয়, হৃদয়মন্থন করে চলে গেছে রূঢ় আঘাত দিয়ে এক বে-দরদী, আর সেই বেদনার অতলে তখনি একটি মধুর সম্ভাবনা অঙ্কুর হয়ে দেখা দিয়েছে। একদিন সেই অঙ্কুরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। তারই মুখ চেয়ে আত্মসংবরণ করেছিল রোশান। বড় সুন্দর পরিবেশ। বড় মধুর প্রলোভন। সামনে উত্তাল তরঙ্গময়ী কালো যমুনা। তারার অস্পষ্ট আলোতে পাহাড় ও প্রান্তরের রেখাগুলি আরো কালো—দূরে জনকোলাহলমুখর নগরী, সেই রাতে বিশ্বপ্রকৃতির কোলের কাছে একা দাঁড়িয়ে ধীরে মন শান্ত হয়েছিল রোশানের। সান্ত্বনা পেয়েছিল খুঁজে, শান্তি পেয়েছিল।

তার পরের ইতিহাস পথেঘাটে ছড়ানো। কত সহরই যে ঘুরল রোশান—পথে পথে কত অনুগ্রহই যে ভিক্ষা করে বাঁচালো নিজেকে—শেষ পর্যন্ত এসে ভীড়ল কাশীতে। সেখানে একদিন এক ফকিরের কুটিরে জন্ম হল মোতির। নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ সেই শিশুকে দেখে রোশান একবার হাসল, একবার কাঁদল। বুকে তুলে নিয়ে বলল,—মেরি মোতি—মেরি লালী—

বিচার যে কোথায় হয়, আর কে যে বিচার করে, সে বড় আজব কথা। সত্যি বলতে কি, তার চেয়ে কোন রূপকথাই আশ্চর্য নয়! যৌবনের উদ্ধত গর্বে কত রোশানের প্রেম পদদলিত করেছিলেন সামসুদ্দীন তার হিসেব নেই। ভাইকে ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে গিয়েই বিবাদ বাধল—আর শৈশবের শুভানুধ্যায়ী ফ্রেজার সাহেবকে খুন করবার জন্য ক্ষেপে উঠলেন সামসুদ্দীন। তরুণ নবাবকে ফ্রেজার বিশ্বাস করতেন ও ভালোবাসতেন। এক অন্ধকার রাতে সামসুদ্দীনের নিযুক্ত ঘাতক তাকে হত্যা করল। ফলে বন্দী হলেন সামসুদ্দীন। বিচারে প্রাণদণ্ড হল তাঁর।

সহরের খোলা জায়গায় ফাঁসীমঞ্চে উঠতে উঠতে গতজীবনের কথা সামসুদ্দীন একবারও ভেবেছিলেন কিনা কে জানে! তবে কতিপয় নর্তকী তাঁর মৃত্যুতে কেঁদেছিল, আর ফাতেহা পড়েছিল তাদেরই অনুরোধে মৌলভী। সে কথা শুনে রোশান মর্মাহত হয়েছিল। অশ্রু মোচন করেছিল গোপনে। সেই সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, আয়তনেত্র, প্রশস্ত ললাট—কোথাও কি এ হীন পরিণতির কথা লেখা ছিল?

কোন নারী মাতা হয়ে সার্থকতা পায়—কারো সার্থকতা প্রেমে। মৃত্যু সামনে নিয়েও রোশানের হৃত চেতনায় তার জীবনের একমাত্র সুখস্মৃতিই উৎসবের সজ্জায় সেজে উঠল।

সহসা বড় মধুর অনুভূতি হল রোশানের, বড় সুন্দর, শান্ত আর গভীর কোনো ভালবাসা যেন তাকে ঘিরে ধরেছে দুই হাতে।

এ আর এক প্রেম। তার প্রেমিকের মত নিষ্ঠুর চিত্ত নয় এই অতিথি। দেহের

সমস্ত বন্ধন অস্বীকার করে সে রোশানকে টেনে নিল বলিষ্ঠ বাহুতে—, সেই শেষ আত্ম-সমর্পণের মুহূর্তে সমস্ত চৈতন্য হারিয়ে গেল রোশানের। চোখের কোণে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু।

মোতি তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সঙ্গিনীরা যখন রোশানের মুখখানা ঢেকে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তখন মোতির ঘুম ভাঙল।

তাকে কোলে তুলে নিল মৈনু। রোশানের মায়ের আমলের চেনা সারেঙ্গীওয়ালা। বলল,—বেটি আজ থেকে তুই আমার—, তারপর বলল,—ভাবিস্ না, রোশান, সব ঠিক আছে।

উর্স-এর জন্যে অপেক্ষা না করে পরদিন ভোরেই সে মোতিকে কোলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

পথে পথে জীবন সুরু হ'য়ে গেল মোতির।

দুই

'বহিছে নির্মল সলিলে শত তটশালিনী যমুনে'—

শত তটশালিনী যমুনার উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গ দেখে কবে বৃন্দাবনের কন্যাদের মন উতলা হত সে সব দিন পুরোন কথা। সাল ১৮৪৩। পাহাড়ে বর্ষা নামলে যমুনার জল এখনও উথলে ওঠে সত্যি, কিন্তু সে জলে চাষীর মাঠ ভেজে না। বালির বুকে ক্ষীণ ধারায় চাষীর স্বপ্ন মরে যায় স্রোত না পেয়ে, গ্রীষ্মে ক্ষীণস্রোতা যমুনা আর বর্ষায় তাতে ঢল নামে।

বৃন্দাবনের প্রেমকে গল্পে গানে গাথায় নির্বাসন দিয়ে সম্রাটের প্রেমের মর্মরস্বাক্ষর-তীরে বয়ে ধন্য হয়েছে যমুনা। হীরা মুক্তা মাণিক্যের ইন্দ্রজালচ্ছটার দিনও মুখ লুকিয়েছে। আজ যমুনার দুই তীরে গ্রাম আর জনপদ। অধিবাসীরা প্রায়শ মুসলমান। সিপাহীগিরি তাদের মনের মতন পেশা। কিন্তু তরবারি হাতে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে রাজারাজড়াকে সেলাম জানাবার ভাগ্য যাদের নেই তারা আজও চাষ করে। জোয়ান হাতে চাষ ক'রে পরের গোলায় ফসল ভরে, আর ঘরে ব'সে পূর্বপুরুষের জাঁকজমকের গল্প করে। ভাগোর ছেঁড়া কাঁথাখানার গায়ে রঙ-বেরঙের তালি দেয়। লেখাপড়ার কথা বললে হা হা ক'রে হাসে। বলে—

ভুঁখে সে কহা
দো ঔর দো কেয়া?
কহা চার রোটিয়াঁ।

এইসব মানুষের বসতিধন্য বিঠৌলি গ্রাম এলাহাবাদের একান্ত সন্নিকটে। গ্রামের উঠতি মানুষ হচ্ছে লালা আর চৌধুরীরা। তাদের বাড়ি সু-উচ্চ মাটির প্রাচীরে ঘেরা কোঠাঘর কেল্লার মতন দুর্ভেদ্য। আলোবাতাসবিহীন, শাদা রঙ-করা কোঠাঘরে পাকা ছাদ। দাস-দাসী ছাগল-মহিষ নিয়ে সে এক সদাগুঞ্জরিত মৌচাক। পালায়, পরবে, দশেরা ও বিয়েতে লালারা হাতি বের করে জলুষ লাগিয়ে। ঘোড়ার পিঠে ব'সে গোলাপী পাগড়ি-বাঁধা সেরস্তা পেতলের পরাণ থেকে বিতরণ করে গাঁয়ের দরিদ্র ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে গুলাবী রেউড়ি, তিলছড়ি আর সোহন হালুয়া। তাদের বাড়ির মানুষ মরলে পাথরের স্তম্ভ ওঠে শ্মশানভূমিতে। কোম্পানীর সাহেবরা কালে-ভদ্রে এলে লালাদের বাড়ি থেকে তাঁবু যায়। খানাপিনার খরচও বহন করে তারাই।

বছরে একবার ক'রে তীর্থে তীর্থে যায় লালাদের বাড়ির লোকেরা। মথুরা, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন,—সর্বত্র মন্দিরে মন্দিরে লালাদের অনেক দান আছে। দান বললে সন্দস্ত হ'য়ে জিভ কাটে লালার মা—ছি ছি, মানুষ হ'য়ে সে কি দেবতাকে দান করতে পারে? এমন কি ভাগ্য তার?

দান সে করে না। শুধু বিশেষ বিশেষ দিনে বুকে হেঁটে দণ্ডী কেটে মন্দিরে গিয়ে রুপোর তুলসীগাছ আর সোনার শঙ্খ মানত ক'রে আসে।

মানত পুরো হবার পর দিন আগে আগে গিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো দেয়। দেবতার আশীর্বাদ চায় তার পরিবারের ওপর : ভাগ ভালা হোয়।

সে কামনা সার্থক হয়েছে বলা চলে। শুধু নিজেদের ভাগ্য নয়। গাঁয়ের শতকরা নব্বইজনের ভাগ্য বাঁধা পড়েছে লালাদের মহাজনী খাতায়। তেজারতী সুদের কারবারের হিসাব সব ছোট ছোট নাগরী হরফে লিখে রেখেছে লালা। খাতাটা বেঁধে রেখেছে তেলচিটে দড়িতে। বকেয়া সুদ মেটাতে জীবন কেটে যায় কিষাণের, ঘরে ঘরে অনটন দেখা দেয়, এদিকে লালাদের গোলা উছলে প'ড়ে যায়, মহিষ দুধ দেয় অন্য ঘরের দেড়গুণ, সৌভাগ্যের পসরা সর্বদা ষোলকলায় পূর্ণ হ'য়ে থাকে।

হিন্দু বাসিন্দাদের মধ্যে লালাদের প্রতিপত্তিই বেশি। তাদের ঘর ছেড়ে দু'কদম এগিয়ে গেলে শুরু হবে মৌলভী সাহেবের মস্ত কোঠাবাড়ি। বড় আমীর মানুষ মৌলভী, টাটকা মেহেদি পাতার রঙের তাঁর দাড়ি। আর হাতের আঙুল জাফরাণ। বড় মিঠে গলা মৌলভীর, কথায় কথায় ফার্সি তত্ত্বকথা টেনে এনে শ্রোতাকে সমঝে দেবার কায়দা একেবারে পাকা শিকারীর মতন রপ্ত তাঁর।

দিনকাল পালটে যাচ্ছে, একথা প্রায়ই তিনি ব'লে থাকেন। সাল ১৮৪৩। চারপাশে ইংরেজদের ছাউনি। সুদূর কলকাতায় নাকি তাজ্জব সব ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। তাঁর শৈশবে এমনধারা ছিল না। তখন লোকে মৌলভীর নামে তিনবার সেলাম করত। ফসল, মহিষ, সোনারুপো, কাপড়চোপড় সবই নিত্য নিত্য ভেট আসত মৌলভীর ঘরে। এখন আর সেদিন নেই।

মৌলভী সাহেবের মক্তবে ফার্সি প'ড়ে কতজন লায়েক হ'য়ে গেল। প্রথমে ছেলেকে আনবার আগে বাপ এসে লম্ফ সেলাম দিল। পেছনে ছোকরা ব'য়ে এনে নামাল বড় একটা ডালা। ঘরে পালা মুরগী-মুরগা, মৌলভীর বিবির জন্যে আসলামা কাপড়, তামা-পিতলের বাসন। ছোট চোখ ক'রে দেখে দেখে মৌলভী অল্প অল্প হাসেন। তারপরে ছেলে আসে পড়তে। চার বছর ধ'রে মক্তবে ভারে ভারে কত জিনিসই যে আসে। বিকানীরের মিছরি আর লক্ষ্ণৌ-এর চিকনের থান, দিল্লীর নাগরা আর আগ্রার আতর, দেহাতের ঘি, থালা-ভরা সেউ, সীমাই আর ফালুদার নানান উপকরণ।

শেখ মসল হার্দন, সাদীর পন্দনামা, গুলেস্তাঁ, বুস্তাঁ, জোমে খাঁর জামেজল কওয়াসিন, মুনসী জানমিরের খত্, এইসব দুলে দুলে পড়ে ছেলেরা। মাটিতে আঁক কেটে শেখে আলেফ, বে, তে। ফার্সি লিখতে শেখে মুক্তার মতন গোটা গোটা অক্ষরে।

তারপর লায়েক ছেলেকে শহরে নিয়ে যায় বাবা। ভেট লাগায় চেনাপরিচিত এলেমদার সব লোক খুঁজে খুঁজে। সরকারী দফতরে হোক, বা কোন রাজা আমীরের কাছারীতে হোক, একবার ঢুকতে পারলে হয়। তখন শুধু আর্জি লেখ, হিসাব লেখ, খাতা রাখো। ওদিকে খিড়কি দিয়ে টাকা আসবে সিন্দুকে। জমি খরিদ হবে গাঁয়ে। বিবি পরবে হীরের নথ, ঝাপটা, পায়ে পরবে জরির চটি, বুড়ো বাপ মা হজ করবে বছর বছর।

বড়মানুষ হবার নেশা যাদের তাদেরই এই সব সাজে। এদিকে-ওদিকে অনেক মানুষ আছে, যারা দিনমান ক্ষেতে চাষ করছে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে। তাদের বিবিদের পর্দা থাকা বড় মুস্কিল। শিকারের মাংস শুকনো ক'রে রেঁধে চাপাটি আর ভাজির সঙ্গে সানকীতে সাজিয়ে মাঠে পাঠায় তারা পুরুষের সঙ্গে। ফসল ঝাড়তে বাছতে, গম ধুয়ে শুকোতে, গম পিষে আটা বানাতে, জ্বালানী কুড়িয়ে উনুন ধরাতে, মুরগী তুলে ঘরে বন্ধ করতে তাদের দিনমান কেটে যায়। সন্ধ্যাবেলা বসে বাতি জেলে রঙিন সুতোর বিনুনী গাঁথে কেশসজ্জার জন্যে। পরবের দিনে রুপোর গয়না ঘষে মেজে পরে তারা, মেহেদি পাতার অঙ্গরাগে রাঙায় হাত, পা, নখ।

তাদের পুরুষদের দীর্ঘ দেহ, চওড়া বুক, গৌরবর্ণ, প্রশস্ত কপাল। বাদশাহী আমলটা হচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষ। বাদশাদের হ'য়ে এখানে সেখানে বেতনভোগী সিপাহী হ'য়ে লড়ে বেড়াবার পর থেকে ক্রমে স্থানস্থিতি হলো। তলোয়ার খুলে রেখে হাত দু'খানা লাঙল তুলে নিল। সবই রুজির জন্যে। এ কাজেও হাতে কড়া পড়ল একদা লড়ে লড়ে যেমন পড়েছিল।

এখন চওড়া পাথর-বাঁধাই ইঁদারা থেকে ঘোড়া আর মহিষের সাহায্যে জল তুলে ক্ষেতে ক্ষেতে দেবার কাজ। ছেলের চেয়েও যত্ন ক'রে গমের চারাকে বড় ক'রে তোলার দায়িত্ব। ফসল পাকলে সোনালি-সবুজ গমের খবর নিয়ে বাতাস চ'লে যায় এদিক ওদিক। তখন হরিণ আর শুয়োর বেরিয়ে আসে আঁধারে আঁধারে। ক্ষেতে মাচার ওপর ঘর বেঁধে রাত কাটায় পুরুষেরা। নজর ঠিক ক'রে নিশানা ধরে নিয়ে অব্যর্থ সন্ধানে ছুঁড়ে দেয় বর্শা আর ভাল্লা। তীব্র আর্তনাদে জানোয়ার পিছু হটে।

কখনো কখনো আঁধারের মধ্যেও আঁধার দিয়ে গড়াদেহ হাতির পাল আসে। ভাবারের জঙ্গল ছাড়িয়ে কুমায়ুনের পাদদেশ দিয়ে জঙ্গল ধ'রে ধ'রে তারা নেমে এসেছে। পাকা ফসলে দারুণ লোভ।

এই দুনিয়াতে চোখ মেলবার সময় থেকে খোদার মেপে দেওয়া সাড়ে তিন হাত মাটি নেওয়া পর্যন্ত কতবারই যে লড়তে হয় তাদের! একেবারে শিশুকালের কথাটাই জানা নেই। তারপর মরদ হলে তিনবার লড়তে হবেই হবে। ছেলেবয়সে বাপের সঙ্গে, যৌবনে স্ত্রীর সঙ্গে আর পরে ছেলের সঙ্গে। তা' ছাড়াও সারাজীবনে উঠতি পড়তি যে কত তার দিশা কে করে! দুনিয়ার সঙ্গে নিত্য মোকাবিলা করতে গিয়ে কত জখম বুকে ক'রে নিয়ে ঘরে ফেরে পুরুষ কে তার মর্ম বুঝবে? মরদের মতন মরদ হ'য়ে বাঁচতে হলে দুশমন দু'টো একটা আসবেই জীবনে।

আর মোকাবিলাই যদি না হলো তবে জীবনের রঙটা কোথায়! সে কেমন তরোয়াল যাতে চোট লাগে না! সে কেমন জীবন সংগ্রামে, প্রেমে, জয়ে ও পরাজয়ে যার শতরঞ্চের এক একটা ঘরে এক একটা নতুন নতুন রঙ লাগেনি?

বিশেষ ক'রে এরকম সময়, এমনি ধারা দিন, যখন হিন্দুস্থানের মানুষের অজান্তেই দেশের ভাগ্যলিপিখানা কিনে নিয়েছে ইংরেজ। এই তো বাঁচবার সময়।

এ এক আশ্চর্য দিন, এ এক অদ্ভুত সময়। সাধারণ মানুষের ভূমিকা ক্রমেই প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠছে। এসময়টা দেখবার, জানবার আর বাঁচবার। আজকে যারা গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে পাঁকে পা মজিয়ে জাহাজ বোঝাই ক'রে সম্পদ বিলাতে পাঠাচ্ছে, তাদেরও প্রাণের দাম একটা হবেই হবে। সেই সময়ও আসছে। প্রস্তুতি চলেছে দেশব্যাপী রঙ্গমঞ্চে। যতদিন না সময় হচ্ছে ততদিন অবধি লাঙল চালাবে কিষাণ, সাহেবের খিদমৎগারী করবে হিন্দুস্থানের জোয়ান।

তিন

গ্রামের একান্তে আনোয়ারের ঘর। এ তল্লাটে এমন কেউ নেই যে আনোয়ারকে চেনে না। দেমাকী মানুষ আনোয়ার আর তার ছেলে খুদাবক্স। ছেলেটার বয়স সবে চোদ্দ হবে কিন্তু চলে মাথা উঁচু ক'রে। গান গায় বে-পরোয়া গলায় আর মৌলভীর শাসনকে তিন তুড়ি দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার বাপের এত তেজ এল কি করে? ভেবে ভেবে অবাক মানে গোকুলদাস। জমি বলতেই বা কতটুকু। ক্ষেতীর চেহারাই বা কি।

সে কথা বললে দাড়ি চুমরে হা হা ক'রে হাসে আনোয়ার। হাতিকে কুঁদতে শেখালো কে? শের লড়ে কোন জোরে? দুনিয়ার মাটিতে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই তেজ তারা নিয়ে জন্মেছে। আনোয়ারের তেজও নাকি ভেতরকার জিনিস। তার বাপের গল্প আজও ঘরে ঘরে চালু।

আনোয়ারের বাপ ইউসুফ ছিল সে সময়কার খেলিয়ে। দীর্ঘ পেশল দেহ। সুঠাম শরীর আর অমিত তেজ দিয়েছিল ভগবান। কিন্তু ধনদৌলত ছাপ্পর ফুঁড়ে দেয়নি। ধন-দৌলত সে দিন রাজারাজড়ার ঘরে থাকত। তাই খেলা দেখাতো ইউসুফ। খেলা দেখাতে দেখাতে নিজেই কখন পুতুল হ'য়ে গেল ভাগ্যের হাতে, আর নতুন খেলা শুরু হলো তার জীবনে। সে বড় আজব কাহিনী, রূপকথার চেয়েও অদ্ভুত।

আনোয়ার শুনেছে তার বাবা ইউসুফ নাকি বাঘের সঙ্গে লড়ত রাজপুরের রাজবাড়িতে। চল্লিশ বছরের জোয়ান পাঠানের সেই দর্পিত ক্রীড়া দেখে মন টলেছিল রাজাসাহেবের চতুর্দশতমা পত্নী জানকীর।

জানকী যখন লুকিয়ে দেখা করেছিল তখন ইউসুফ বলেছিল, চলো পালাই। ভরসা আছে তো?

নিশ্চয় ভরসা ছিল। ভাঙা মন্দিরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জানকী জোরগলায় বলেছিল ইউসুফকে, হ্যাঁ তার ভরসা আছে।

উনিশ বছরের রাজপুতানী আর চব্বিশ বছরের পাঠান। মরুভূমির পটভূমিকায় প্রেম, জিঘাংসা, হত্যা ও রোমাঞ্চের দুরন্ত উন্মাদনা তাদের রক্তে রক্তে আছে। সেই ঐতিহ্য তাদের বেপরোয়া করল। স্থান, কাল, পরিবেশের কথা ভুলে গেল তারা। মনে হলো দুনিয়া তাদের পায়ের নিচে। ওপরে আকাশ, নিচে জমি, আর মানুষ শুধু তারাই দু'জন।

রক্তে রক্তে দোলা লেগে ঢেউ উঠল উত্তাল হয়ে। সেই ঢেউয়ে নৌকা ভাসিয়ে বে-দিশা ইউসুফ সুন্দরী জানকীর মুখ চেয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভাসলো। প্রেম এলো বন্যার মতন। আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, বাঁরাওন আর মুক্তকেশ, বন্দরে বন্দরে সেই বন্যার ধাক্কায় ভেসে বেড়ালো দু'জনে। কিন্তু সেই মুক্ত প্রেমে অভিসম্পাত এল দৈবের রূপ ধরে। দুরন্ত গরমে সেবার যখন সর্বত্র হাহাকার উঠেছে, ক্ষেত জ্বলে যাচ্ছে, কুয়ো শুকিয়ে উঠছে, হিমালয়ের বুকে বরফ গলে তখন ঢল নামল নদীতে। রাতারাতি বন্যা এল দুর্বার হ'য়ে। ভেসে গেল বাঁরাওন আর সোঁগড়—লক্ষ্ণৌ-এর উত্তরের সমৃদ্ধ জনপদ, আর সেই বন্যায় ভেসে গেল ইউসুফদের ঘর।

উত্তাল জলের মুখে তারা দু'জনেই ভেসে গিয়েছিল। ইউসুফকে বাঁচাতে গিয়ে গোমতীর উত্তাল স্রোতে কোথায় তলিয়ে গেল জানকী, তার একুশ বছরের যৌবন আর হাজারটা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। অচৈতন্য ইউসুফকে জল থেকে তুলেছিল নবাবের জঙ্গলের ইজারাদার আর তার মেয়ে সেবাযত্ন ক'রে বাঁচিয়েছিল। সে ঋণ শোধ করবার নয়। তাই ইউসুফ পরে বিয়ে

করেছিল তাকে।

ঘর বেঁধেছিল ইউসুফ, ক্ষেতী ধরেছিল অনভ্যস্ত হাতে। মাঝরাতে ক্ষেতের ওপর মাচা বেঁধে ব'সে শুয়োর তাড়াতে তাড়াতে তীব্র বাতাসে ভেড়ার কম্বল জড়িয়ে কাঁপত ইউসুফ, আর মনে মনে নাড়াচাড়া দিত জানকীর কথা। ঘর বেঁধে সে কী অন্যায় করেছে? জানকী কি তাকে দোষ দিচ্ছে? ঘর বাঁধতে জানকীও চেয়েছিল। রাজার রাণী হ'য়েও ইউসুফের সঙ্গে জাঁতার শব্দে মুখরিত, শিশুর কলকণ্ঠে মধুর, কাঁচের আর রূপোর চুড়ির নিক্কণে মুখর একটি সাধারণ পরিবেশ রচনা করবার কামনা ছিল তার। চাঁদের আলোতে ঘুমন্ত জানকীকে মনে হত জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া। মায়াময় তার সৌন্দর্য, ইউসুফের মনে হত বুঝি আসমানের কোন পরীকেই সে জোর ক'রে বন্দী ক'রে রেখেছে। কিন্তু জানকী তার আশঙ্কাকে দর্পিত ভ্রূকুটিতে পরিহার করত। সে রাজপুতানী, বিশ্বস্ততা তার জাতের ধর্ম। তার দাদী পরদাদী সব 'সোহাগণো সতী'। সোহাগণো সতী সেই হয়, যে স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ করে, অনুমৃতা রমণী সোহাগণো। 'ইমা নারীরঃ বিধবা—' এই মন্ত্র সে কতবার শুনেছে।

সেই ঐতিহ্য নিয়ে বিধর্মীর সঙ্গে কেমন ক'রে ঘর বাঁধলো জানকী? ইউসুফের সাদর প্রশ্নের জবাবে জানকী কৌতুকভরা চোখে হাসতো। তার চোখেই যেন জবাব পেত ইউসুফ। ইউসুফের সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়েছে জানকী, সেখানেও সে তার ধর্মকে মেনেছে। এই ধর্ম যৌবনের। যৌবন অল্প কয়দিনের জন্যে আসে, কিন্তু তার দাবীই কী কম? রাজান্তঃপুরে বহুজনের একজন হ'য়ে কোন্ নারী সুখী হ'তে পারে? হীরের কঙ্কণ, মোতির মালায় কী সুখ বাঁধা পড়ে? ঊনবিংশ শতকের বালাকাল। মর্মরকোঠায়, মণিকক্ষে নারীদের শুধু প্রিয়া হ'য়ে বেঁচে থাকবার অধিকার দিয়েছে সামন্ততন্ত্র। সুন্দরী রমণী হবে প্রিয়া, এবং বংশধর আনবার জন্যে বিবাহিতা পত্নী হবে জননী।

সে নির্দেশ মেনে নিয়ে এক জীর্ণদেহ শ্লথমুষ্ঠি নৃপতির অনুগতা পত্নী হ'য়ে চতুর্দশ-লোক স্বর্গে সুখ ভোগ করবার দুরাশায় যারা সতীর মৃত্যু বরণ করে, তাদের একজন হ'য়ে থাকতে চাইল না জানকী। সে কোন একজনকে আশ্রয় ক'রে লতার মতো পুষ্পিত হ'তে চাইল। জীবনের পরমলগ্নে কোন একজনকে বরণ ক'রে তার চোখে অনন্যা হ'য়ে উঠতে চাইল। কারো জীবনে সে একমাত্র হবে, শ্রেষ্ঠ হবে, প্রেয়সী হবে, এই সত্যকেই সে ধর্ম ব'লে মানল।

তবু সব ফুরিয়ে গেল। আজ যদি অনেক ক'রেও চায় ইউসুফ কখনো তাকে আর দেখতে পাবে না। আর কখনো গোমতীতে কিস্তি ভাসিয়ে তারা বেয়ে চ'লে যাবে না বাঁরাওনের জঙ্গলের পাশের সেই ছোট্ট পাথরের বাড়িতে, মিঠে গলায় জানকী আর গাইবে না—ইয়াদ রাখো ঘো প্যার নাম সে বুলায়া—

সেই সব বসন্তের দুপুরের মতো উজ্জ্বল, মধুর, আবেশবিহ্বল দিন—বেলী চমেলী সে কোয়েল আশাঁক্ বনি হায়—। বেলা ও চামেলীর গন্ধমত্ত কোকিলের গানের মতো মিঠে গরমের রাত, উর্দু বয়েৎ আর ব্রজবোলির গানে গানে মাতাল প্রেম, এই দুর্লভ স্বর্গ তার জীবনে এনেছিল যে মেয়ে, সে আবার বে-ঠিকানা হ'য়ে হারিয়ে গেল।

যদি কোন অদৃশ্যলোকে থাকে জানকী তবে সে নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করেছে। ক্ষমা করেছে ঘর বাঁধবার জন্যে, সাদী করবার জন্যে, শিশু আনোয়ারের জন্যে। ইউসুফের অন্য উপায় ছিল না। জানকীই যখন রইল না, তখন নতুন ক'রে জীবনটাকে মাতাল রঙে রঙিন করবার ইচ্ছাই তার চলে গেল। বিচিত্র রঙের কত ইচ্ছাই যে নিয়ে গেল জানকী, কত ইচ্ছাই

যে ভেসে গেল সেই সন্ধ্যায় গোমতীর জলে, শুধু মনে মনে চিরন্তন পুরুষের মতো শিশু ও পত্নী নিয়ে একখানা ঘর বাঁধবার সাধারণ ইচ্ছাটাই রয়ে গেল।

সাধারণ ইচ্ছা নিয়ে সাধারণ জীবন কাটিয়ে যেত ইউসুফ, কিন্তু শিকারীর মৃত্যু তেমন ক'রে আসে না। আসে না ব'লেই হয়ত জীবন হ'য়ে উঠল এক সংগ্রামক্ষেত্র। ইংরেজ সাহেবদের আনাগোনা সুরু হ'য়ে গেল গাঁয়ে।

সাহেব ছাউনি ফেলতে এলে জ্বালানী কাঠের জন্যে হামলা ক'রে ফিরত তার সেরেস্তাদার। গরীবের ঘর থেকে টেনে নিয়ে যেত হাঁস মুরগী।

একদিন সেরেস্তাদার কোপ লাগালো ইউসুফের সারা বছরের বন্ধু ভাল ফলনের আম-গাছটায়। খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এল ইউসুফ। গাছটা তখন আধা কাটা হ'য়ে গেছে। সেরেস্তাদার বলল,—পাঁচ টাকা তো মিলবেই তোর।

শুনে ক্ষেপে গেল ইউসুফ। টুঁটি ধ'রে ছিটকে ফেলে দিল গুজারী দু'টোকে, যারা কাঠ কাটছিল। সেরেস্তাদার ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তার দলে ছিল আট দশজন, আর এদিকে ইউসুফ একা। অসম সেই মারামারিতে চোট লাগলো ইউসুফের মাথায়।

গাঁয়ের মানুষ ভেঙে এল। প্রাণ নিয়ে পালালো সেরাস্তাদার, কিন্তু ইউসুফ বাঁচলো না। তিনদিন তিনরাত ধরে শুধু ভুল বকলো সে, এতটুকু জল খেলো না। শেষ সময় অবধি গালাগাল ক'রে গেল সেরেস্তাদারকে।

পরে অবশ্য গোর-কাফনের টাকা দিতে চেয়েছিল সাহেব। সেরেস্তাদারকে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সে টাকা নেয়নি। আনোয়ারের মা বলেছিল, ও টাকা তার কাছে হারাম।

এমনি ক'রে মৃত্যুবরণ করেছিল ইউসুফ, যার হিম্মতের কথা আজও গল্প হ'য়ে আছে। যদিও তার ছেলের বয়সই পঁয়ত্রিশ হ'তে চলল।

সেই ইউসুফেরই ছেলে আনোয়ার। কিন্তু এক পুরুষেই ভাগ্যের রদবদল হ'য়ে গেছে। দাদাপরদাদার আমলে নাকি অভাব কাকে বলে তা মানুষ জানত না। যমুনা জল দিত, মাটি দিত ফসল, আর আকাশ থেকে থোদা ঢেলে দিত সুখ-সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য আর নিরাপত্তা। সেই দিন কেমন করে বদলে গেল, সেই কথাই ভাবছিল আনোয়ার—উঠোনের আমগাছটার তলায় চারপাই'টা বাঁধতে বাঁধতে।

ফসলের মৌসুম শেষ হ'লে সাহেব তাঁবু ফেলে ফেলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে। তখন ভেট লাগায় তালুকদার,—জী হুজুর মেহেরবান, জিন্দগী রাখনে কা ঔর মারনে কা মালিক,—

কয়দিন গাঁয়ে খুব হৈ চৈ লেগে যায়। ছাগল, ভেড়া, মুরগী, হাঁস, দুধ, মধু, ঘি আর কাঠ ভারে ভারে চলে যায় সাহেবের তাঁবুতে। সাহেবের আমীন গোঁফে চাড়া দিয়ে নাগরা জুতো মস্‌মস্‌ করে বীরদর্পে গাঁয়ে টহল দিয়ে ফেরে। ছেলেরা আড়াল থেকে অবাক চোখে দেখে সাহেবকে, আর কুয়ো থেকে জল নিয়ে ফিরতে ফিরতে মেয়েরা আড়চোখে মেম্‌সাহেবকে দেখে নিজেরাই লজ্জা পেয়ে যায়।

সবই ঠিক ছিল কিন্তু দিনকে দিন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে সব। বদলে যাচ্ছে চুপিসাড়ে। দিনের গতিবিধি ঠিক যেন ধরা যাচ্ছে না।

এমন ধারা ছিল না দিন। গত সাত বছরের মধ্যে চার সন গেল অজন্মা,—ক্ষেতে ক্ষেতে সোনা-রং গম জল না পেয়ে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। অজন্মা গেল ত শুরু হলো

প্লাবন, পর পর তিন সনই বন্যা, যমুনা উত্তাল, ক্ষেতী জমি ঘর বাড়ি, সব ভেসে গেল বানের জলে।

বন্ধু নন্দলালের কথা মনে পড়লো আনোয়ারের। এইসব আপদ-বিপদের কথা যখনই ওঠে তখনই তার বন্ধু নন্দলাল কার্যকারণ দিয়ে বলে—কি জান, দুনিয়া থেকে 'ধরম' জিনিসটা নাশ হ'য়ে যাচ্ছে, তাই এই বিপত্তি।

হবেও বা। নইলে কত কি-ই যে আজগুবী ঘটে যাচ্ছে তার কূলকিনারা মেলে না কেন?

নন্দলালের দাদা ছগনলাল, একটানা দু'বছর মানসিক ক'রে নর্মদার জলে স্নানদান করতে গিয়েছিল গত বছর। দু'মাস আগে সে ঘরে ফিরে এসেছে। বলেছে,—হিন্দুর শাস্ত্রই বল আর মুসলমানের কোরাণই বল, কি নর্মদাগঙ্গার জলধারা কি হেরা পাহাড়ের পুণ্যধারা, সব কিছুর গুরুত্বই কমিয়ে দিয়েছে সরকার,—নতুন অংরেজ সরকার। এখন সাক্ষী মানতে, কি সাহেবের কাছে কথা কইতে, কথায় কথায় সাহেবেরা মানুষদের হলফ খাওয়ায়। ছোট ছোট বিষয়ে, পাপপুণ্য আর স্বার্থের বিচারে বিধর্মী সাহেবের নির্দেশে হলফ খেয়েছে বলেই মাথাহেঁট হ'য়েছে দুই ধর্মের। তাই বিরূপ হয়েছেন দীন-দুনিয়ার মালিক।

সবচেয়ে বড় অধর্মের কথাটা বলে নন্দলাল নিজেই হতবাক হয়ে যায়। তার কানের কাছে মুখ দিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলে, তোমার ধর্মে মানা নেই, তবু সেই মাংস কখনো খেয়েছ?

তোবা! তোবা! বলে, নাক কান মলেছে আনোয়ার। সেই মাংস মানে নিষিদ্ধ গরুর মাংস। কথাটাই মুখে উচ্চারণ করতে পারে না নন্দলাল।

ধর্মে মানা নেই তাই কি?

ধর্ম-ত একটা নয়, ধর্ম হাজারটা, ব্যবহারিক জীবনেও ধর্মাচরণ আছে। যে প্রতিবেশীর সঙ্গে শৈশব থেকে হেসে খেলে বড় হয়েছে, তারও মন আছে, বিশ্বাস আছে; তা-ও তুমি ভাঙতে পার না। তাতেও ধর্ম ক্ষুণ্ণ হবে। সেইজন্য একই গাঁয়ে পাশাপাশি বাস করে দশহরা আর মহরম, হোলি আর ঈদ, নির্বিবাদে পালন করেছে মানুষ। নন্দলাল বলে আর মাটিতে চোখ বিঁধিয়ে শোনে আনোয়ার।

নন্দলাল বলে যায়, আজ ত তেমনটি আর থাকছে না। সাহেবেরা নির্বিচারে আজ সেই মাংস সর্বত্র ভোজন করছে।

—সর্বত্র?

—কেন নয়? এখন কি ধরিত্রীতে এমন কোন জায়গা আছে, যেখানে সাহেব নেই? এমন কি কোন গ্রাম আছে যেখানে বছরে অন্তত দু'দুবার সাহেবদের তাঁবু পড়ে না?

—গঙ্গার এপারেই কি আর ও পারেই কি!—গঙ্গা এখানে, দক্ষিণে নর্মদা। গঙ্গা যমুনার জলে স্নানে পুণ্য; জলস্পর্শ হ'লে তবে পুণ্য আসে। নর্মদা চিরকুমারী, পবিত্রতার মূর্ত প্রকাশ। নর্মদার দর্শনমাত্রে পুণ্যার্থীর পুণ্য হয়। কিন্তু সাহেবদের ব্যাভিচারে নর্মদাও আজ বিরূপ। সেখানেও চলেছে বছর বছর দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি আর বন্যা,—প্রকৃতির খামখেয়ালী অত্যাচার। একমুষ্ঠি অন্নের স্বপ্ন চোখে নিয়ে সেখানে মাঠের রাজা কিষাণী কিষাণীর হাত ধ'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে পথে। সাগরশহরের রাজপথে তারা কাতার দিয়ে পড়ে মরেছে। মায়ের কোলে মরেছে ছেলে, বুড়ো বাপের অন্ধের লাঠি তার

সোহাগী মেয়ে মরেছে পাশাপাশি।

নন্দলালের চোখ রক্তজবা। বলে,—ভক্তজনের ওপর দেবতা কি কখনও বিরূপ হয়? তবে কেন হলো এই মহাপাতক? কোন পাপে? কার পাপে?—ঐ সাহেব,—সব করেছে ঐ সাহেবরা।

আনোয়ার ভাবে, নন্দলাল যে কথা বলে, আজ অনেকেই সেই কথা বলাবলি করে। সেদিন দরগার ফকির সাহেবের কথায় আনোয়ার জেনেছে, ন্যায়ধর্ম যে জলাঞ্জলি দিয়েছে সে ত মহাপাতক বটেই, কিন্তু সেই মহাপাতক বরদাস্ত করে যারা আজ মুখ বুঁজে আছে তারাও মহাপাপী। এ-দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি তাই তাদের কপালে চিরকালের মত বরবাদ। সুতরাং আমি তুমি, সকলেই দোষী। রাজার পাপে নষ্ট হয়েছে রাজ্য, আর সেই রাজ্যের প্রজা হয়ে সাধারণ মানুষেরও দুঃখকষ্টের পরিসীমা নেই আজ।

তাই প্রকৃতি বিমুখ। মানুষের এই নিদারুণ দুঃখের দিনে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে অভিমানে।

এই ত কয়েক বছর আগেকার কথা। কি ফলন আর কি ফসল। সমৃদ্ধির ভারে গাছ লুটিয়ে পড়ল ভুঁয়ে। এলাহাবাদ আর বান্দা জেলার মানুষ বলল, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন ফসল কেউ চোখে দেখেনি। মেহনতী মানুষ জিরোবার ফাঁকে ফাঁকে কত গান বেঁধে বৌ-কে শোনাল, এই ফসল থেকেই তার বৌ-এর হাত-ভরতি চুড়ি হবে, গলায় উঠবে রূপোর হাঁসুলি, ইদ্-উল-ফিতর আর ছট পরবের দিনে নতুন নতুন ঘাঘরা আসবে হাট থেকে। সেই সুখের দিনে পায়ের জিঞ্জিরা মল কেমল করে বাজবে! সেই ছন্দে গান গাইল কিষাণ—; আর কালো ভুরু চাঁদের মত বাঁকিয়ে পিয়ারা বৌ শাসন করল তাকে দশজনের চোখ এড়িয়ে, ফাঁকে ফাঁকে।

সন্ধ্যাবেলা উঠোনে চারপাই-এ বসে কত কথাই যে মনে এল কিষাণ কিষাণীর। মনে হল, ভাঙা ঘরে ছাউনী পড়বে, পুরোনো ঋণ শোধ হবে, দাওয়াং দেবে একদিন বন্ধুজন ডেকে। পরবের দিনে ছেলেমেয়ের হাতে ইচ্ছামত গুলোবী রেওড়ি, তিলুয়া আর সোহন-হালুয়া কিনে দেবে।

এইসব একান্ত ইচ্ছার সূত্র ধরে দুটি মন কাছে এল, কত সন্ধ্যা মন্থর হলো ভাষাহারা অনুভূতিতে,—নিত্যকার ব্যবহারে মলিন ভালবাসা সুখের আশ্বাসে উজ্জ্বল হলো।

ভাব পেল না ভাষা,—কথা খুঁজে না পেয়ে কিষাণ কিষাণীর হাতে হাত বুলিয়ে ডাকল, সেই সেদিনের কোমল হাতখানি আজ এমনিধারা শুকিয়ে গেলেও কাল আবার ডৌল ফিরে আসবে। আর কিষাণী-বৌ সগর্বে ভাবল, গমের ক্ষেতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যখন ফসল কাটতে শুরু করবে মানুষ তখন সে দশজনের মধ্যে সেরা। এমন পুরুষ কোন ঘরে আছে?

কিন্তু ভাগ্য এমন, ফসলে রং-ও ধরল আর কোথা থেকে বাতাস বয়ে আনল মড়ার বীজ। গমের শীষে রাতারাতি জাফরাণ রঙের আবরণ পড়ে গেল। তিন দিনে সেই রং গাঢ় বাদামী হয়ে উঠল, আর ফসল ঝরে পড়ল মাটিতে ফোঁপরা হয়ে যেন ভেতর থেকে কে শুষে নিয়েছে। ফসলের মড়ক। এমনি ধারা নাকি ঘটেছিল অনেক অনেক বছর আগে, যখন 'হেস্টিন' সাহেব অযোধ্যার বেগমদের ওপর জুলুম করেছিল, সেই বছর।

খাটিয়া-বাঁধা শেষ হ'তেই উঠে দাঁড়ায় আনোয়ার। পিঠটা সোজা ক'রে হাঁক দেয়,—লাল!

সুউচ্চ কণ্ঠে ঝংকার দিতে দিতে ঢুকল পরী। জল ভরা তামার সোহরাইটা দুম্

করে নামিয়ে রাখল ঘরে আর বক বক করে বাতাসকে শোনাতে লাগল,—এই রকম করে সংসার চালানো তাকে দিয়ে হবে না। ঘরে যে মানুষটা আছে, সেত থাকা না থাকা সমান! এমনই সে বীতস্পৃহ পরীর সম্পর্কে। একটা ছেলে, সে-ও একেবারে অবাধ্য। জ্বালা কি তার কম! এই যে পানি আনতে গিয়ে নিত্যি গোলমাল, কে তার ফয়সালা করে?

লালার বৌ-এর এত অহংকার যে কুয়োতলা জুড়ে বসেই থাকবে আর গল্পই করবে। কেন পরী কি তার দাসী? তার সংসার নেই, কাজ নেই? যমুনার নানীরই বা কি আক্কেল! দুতোলী আটা ধার দিয়েছিল কবে, সে কথা কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে শোনাতে হয়?

মুখ টিপে হেসে আনোয়ার বলে,—এত সাহস পায় কোথা থেকে মানুষ!

—পাবে নাই বা কেন? আমার সোয়ামী ত আর তালুকদার না! আমার নসিবই এমনি।

—আমার সোয়ামীত অরে তালুকদার না! আমার নসিবই এমনি।

রসিকতায় আনোয়ারও কম যায় না। পরীর কাঁধে হাত রেখে বলে,—দে নাম লিখে দে। যমুনার নানীকে হাজতে পাঠাই। লালার বউকে হজিমত দেই। বড় আস্পর্ধা বেড়ে গেছে সব!

আনোয়ারের হাত ঠেলে দিয়ে পরী ঝাঁঝ দিয়ে বলে,—এখন খেলা করবার সময় নয়। অনেক কাজ আমার। এক-উঠোন শুকনো পাতা ঝাড়ু দিতে হবে, রুটী সেঁকতে হবে, ছাগল দুটো তাড়িয়ে আনতে হবে ক্ষেত থেকে।

—কাজে যেতে হয় যা না, ভারী কাজ দেখানেওয়ালী হইছস।—বলল বটে কথাটা কিন্তু পরীকে ছাড়ল না আনোয়ার। চিবুকটা তুলে সে নিরীখ করে দেখল। বলল, মনে পড়ে? সেই ঘর করবি না ব'লে ঘাসের গাড়ির পেছনে চেপে বাপের কাছে পালিয়েছিলি?

—আর তুমি যে ক্ষেত পালিয়ে ভাব করতে গিছলে?

সে সব পুরোনো দিনের কথা ভেবে পরীর চোখে মেদুর স্বপ্ন নামতো যদি না ঘরে ঢুকত তার ছেলে, নাচতে নাচতে।

—মা ক্ষিদে পেয়েছে খেতে দে। হুল্লে সরে গেল পরী আনোয়ারের হাত ছাড়িয়ে, আর আনোয়ার গেল বাজারতলা। সেখানে আজ মস্ত জমায়েৎ আছে।

একদিন এ অঞ্চলের মুসলমান কিষাণরা ছিল সিপাহী, বাদশাহী আমলের ফৌজ। জমি মিলেছিল নবাব বাদশাহের কাছে। তাই ধরেছিল ক্ষেতী। এখন জমি চাষ করে আর পড়তা থাকে না। তার ওপর পর পর কয়েক বছর ধাক্কা খেয়ে রুজীর জন্য চিন্তিত হ'য়ে উঠেছে সকলে। সময় বুঝেই ফৌজী কাজের খবর নিয়ে এসেছে নওলপ্রসাদ এলাহাবাদ থেকে। নতুন কথা বলবে সে।

চার

গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে সোজা বাজারতলার দিকে। পাশে সুউচ্চ শিবমন্দির। এ মন্দিরে ঢোকবার এক্তিয়ার নেই আনোয়ারের। তবু সে জানে শ্বেতপাথরের মেজেতে নাগরী হরফে—পরম সৌভাগ্যবতী অযোধ্যাকুমারীর নাম লেখা আছে।

অযোধ্যাকুমারী হচ্ছে বুড়ো লালার পিসী। সে কি আজকের কথা। সতী হয়েছিল সে। তার আগে পরে আরও অনেকে সতী হয়েছে। নদীর ধারে সারি সারি চৌড়া আছে

তাদের নামে। তবু অযোধ্যাকুমারী তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তার চৌড়া সব চেয়ে উঁচু।

সকালে সন্ধ্যায় স্নান করে ফিরবার পথে হিন্দু মেয়েপুরুষ সেখানে জল ঢালে, প্রণাম করে, আর পুণ্যদিনে মিঠাই ফুল রাখে।

লালাদের ছেলে মাখনলাল আনোয়ারের শৈশবের সাথী,—ছোটবেলার খেলুড়ী। যমুনার চর পেরিয়ে যখন তারা তরমুজ চুরি করতে যেত, তখন নৌকোয় বসে মাখনলাল বলত,—সতী হ'লে কি হয় জানিস? প'য়ত্রিশ কোটী বছর ধরে সতী স্বর্গে থাকে। সতীর মা, বাপ, আর স্বামীর বংশ চোদ্দজন্মের জন্য পবিত্র হয়।

এমনই ভাগ্যের পরিহাস, মাখন যখন চোদ্দ বছরের তখন তার মাকে সবাই ধরে বেঁধে সতী করালে। একমাত্র ছেলে মাখন, তবু তার বাবা অন্য স্ত্রীলোক নিয়ে এলাহাবাদে থাকতো। মা ছাড়া কিছু জানতো না মাখনলাল। বংশমর্যাদা কম ছিল বলে শ্বশুরঘরে বড় ভয়ে ভয়ে আর মুখচোরা হয়ে দিন কাটাতো মাখনের মা। শহরেই মরেছিল মাখনের বাপ। স্বামীর ব্যবহৃত নাগরাজোড়া, যার দাগ নাকি মাখনের মায়ের শরীরটাকে জখম আর মনটাকে ভীতু করে রেখেছিল ষোল বছর ধরে, তাই বুকে করে মরতে গেল সে। তার শ্বশুরবাড়িতে চিরকাল ধরে এমনিধারাই ঘটেছে। এইটাই রীতি।

অযোধ্যাকুমারী ছিল মাত্র বছর দশেকের মেয়ে। কিন্তু তবু সে রেহাই পায়নি। স্বামী মরতেই সে আমের ডাল হাতে লাল কাপড় পরে পিঁড়িতে বসে বলেছিল, সৎ সৎ সৎ। শেষ সময় ভয় পেয়েছিল। লাফিয়ে উঠে পালাতে চেয়েছিল বাপের কাছে। তবু সেই বাপই তাকে জোর করে ধ'রে এনে চিতায় তুলে দিয়েছিল। ঢাক ঢোলের শব্দে তার কান্না শোনা যায়নি। ভাঙ-এর নেশায় হাসতে হাসতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে সে, সেই নাকি তার আসল রূপ। দশবছরে সতী হয়ে পরিবারকে অতুল পুণ্য দিয়ে গিয়েছে অযোধ্যাকুমারী। স্বামীর ভাগের বিশাল সম্পত্তি পেয়ে তার দেওররা চৌড়া তুলে দিয়েছে যমুনার তীরে। আর গাঁয়ে মন্দির তুলে দিয়েছে তার বাপ।

অযোধ্যাকুমারীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মাখনের মাকে বুঝিয়েছিল তার শ্বাশুড়ী ননদ। বলেছিল, মাখনলাল ত' আর ছোট নেই! কতজন যে কচি কচি ছেলেমেয়ে রেখে চলে যাচ্ছে! মাখনের মা ভাঙ আর আফিং-এর নেশায় তখন মাতোয়ারা। কিছু তার কানে ঢুকেছিল, কিছু ঢোকেনি। ধ্বজা উড়িয়ে বাজনা বাজিয়ে, কড়ি ফুল আর মিঠাই ছড়িয়ে বড় ধুমধাম করে তারা নিয়ে গিয়েছিল মাখনের মা-কে। ভাসুর খুলে নিয়েছিল গহনা, আর শ্বশুর তার হাত ভরে তামার পাই ঢেলে দিয়েছিল। দান করুক বউ, অর্জন করুক মহাপুণ্য। হুঁস ফিরেছিল মাখনের মা-র শেষ সময় ছেলের নাম ডেকে। কিন্তু তখন আর সময় নেই। দশখানা গাঁয়ের লোক ভিড় করে এসেছে চারদিক থেকে। ঢাকে ঢোলে ঝনঝনিয়ে বাজনা উঠছে। ধূপের ধোঁয়ায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন। ক'হাজার লোক সমস্বরে জয়ধ্বনি করছে। জ্বলন্ত চিতায় ঘৃতাহুতি দিতে দিতে পুরোহিত উচ্চারণ করছেন, অনশ্রয়ো অনমীবাঃ সুশেবা আরোহন্ত......।

সেই রাতে যখন সবাই ঘাটে বসে হল্লা করছে, তখন মাখন পালিয়ে এসেছিল আনোয়ারের বাড়িতে। আনোয়ারের মায়ের কোলে মাথা গুঁজে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল আর জাতের মুখে তিনবার পদাঘাত করেছিল।

সেই থেকে মাখনলাল ক্রীশ্চান হয়ে গেছে। গাঁয়েও আর ফেরেনি। সবাই জানে সে কানপুরে থাকে। বুড়ো পাদ্রী সাহেবের দৌলতে ফারসী আর ইংরেজী শিখে ছোট মুন্সী হয়েছে। সাহেবের সঙ্গে তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে দোভাষীর কাজ করে। তাছাড়া হিসাব

রাখে, খাতা দেখে। অনেকে বলে, তার নামটাও নাকি পরে বদলে গেছে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে বাজারতলা চলল আনোয়ার।

সকালবেলা। নদীতে স্নান করে ঘটি থেকে জল ছিটিয়ে আশপাশের সমস্ত পথ শুদ্ধ করতে করতে আসছে শিবমন্দিরের পুরোহিত। উচ্চকণ্ঠে দোঁহা গাইতে গাইতে আসছে সে—কিরপা হোই রাঘব রাম সে উধার ভৈল সন্তাপী—। পাথর-বাঁধানো পথের দু'পাশে নিচু দু'তলা বাড়ি। নিচের ঘরে বসে বুড়ো দর্জি সেলাই করছে। মৌলভীসাহেব চাবির গোছা হাতে মক্তবের দরজা খুলতে চলেছেন। শাক, সবজী, দুধ আর ঘিয়ের ভার মাথায় নিয়ে ঘাঘ্‌রা দুলিয়ে উচ্চকণ্ঠে গল্প করতে করতে চলেছে মেয়েরা। যমুনার নানী জাঁতা ঘোরাচ্ছে ঘড় ঘড় শব্দে।

বাজপোড়া জামগাছটা পেরিয়ে বাজারতলা পৌঁছল আনোয়ার। প্রথমেই চোখে পড়ল চারপাই-এর উপর দাঁড়িয়ে মোটা নওলপ্রসাদ চীৎকার ক'রে কি বলছে।

মস্ত বাঁধানো চক। তারই উপরে দাঁড়িয়েছে নওল। ঘিরে বসেছে সবাই। সাদা গোল চিকণের কাজ-করা টুপি মাথায় এসেছেন সম্মানিত বৃদ্ধ গ্রামবাসীরা। কি বলছে নওল? ফৌজী জীবনের কথা বলছে সে। বলছে,—চাকরী মিলবে, ছুটি মিলবে, বুড়ো হলে পেনসিল-ও মিলবে। সেখানে নিরাপত্তা আছে, টাকা আছে, কদর আর খাতির আছে।

কানে কানে হাফিজকে জিজ্ঞাসা করল আনোয়ার,—নওল কবে থেকে এত বিশ্বাসী মানুষ হলো?

হাফিজ বলল,—জাতপাঁত পুছে কোঈ? জনাও পরুকে ব্রাহ্মণ হোই। শহর থেকে ঘুরে এসেছে, ওর বৌয়ের চাচা কানপুরের রিসালাদার। তাতেই ওর ভোল বদলে গেছে। থলি ভরে টাকা এনেছে। নিজের ঘোড়া চেপে এসেছে। গায়ে শাল, পায়ে নাগরা উঠেছে।

নওল বোঝাতে লাগল,—কিষাণ হয়ে জন্মেছ যখন, তখন ধার মাথায় করেই এসেছ। কর্জ্, হ্যায়মর্দন-ই-শোহর। ধার হচ্ছে পুরুষের মনিব। ধার শুধ্‌তে শুধ্‌তে মরে যাবে—আর ধার রেখে যাবে ছেলের ঘাড়ে। শুধু ক্ষেতী করে চলেছে আমাদের বাপ দাদারা। তখন একটাকা রোজগার করলে তিনমাস খেয়েছে মানুষ। এখন পড়েছে টাকার দিন। টাকা আনতে হবে।

জমায়েত থেকে সাড়া উঠল মৃদুগুঞ্জনে। এ-কথায় সকলেই সাড়া দিচ্ছে। টাকার দরকার সকলেরই আছে।

আবার নওলপ্রসাদের কণ্ঠ বেজে উঠল,—ফৌজী জীবন বড় সম্মানের। নবাব সাহেবের যত প্রজা সবাই আজ সেরা ফৌজী সিপাহী। সেইদিন আর নেই, যে পুরোবাট্টা দেবে বলে আধাবাট্টা দিয়ে ঠকাবে। সে হয়েছিল বটে একসময়ে। তখন মনের দুঃখে সিপাহীরা দলে দলে চাকরী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এখনকার সাহেবরা বড় ভালো। সব পুরো বাট্টার চাকুরী, দেশঘরের কাছে। কোন ভাবনাই নেই।

নওলপ্রসাদের কথাগুলোয় সত্যিই যেন কোন আশার বাণী শুনতে পেল আনোয়ার। বড় দরকার হয়ে পড়েছে টাকার। বড় সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে জীবন।

সেইদিনকার কথা নিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে শুরু হলো আলোচনা। তারপরেই এল বিদায়ের পালা। ঘরে ঘরে বিদায় নিয়ে মানুষ চলল যমুনা পেরিয়ে দল বেঁধে। খেয়ানৌকোর ছই-এ বাতি জ্বালিয়ে রাতারাতি কত মানুষ গেল পার হ'য়ে।

ইতিহাসের পাশাতেও নতুন করে দান পড়ছে। কালের অমোঘ বিধানে নির্বাসিত হ'তে চলেছে সেইসব দুর্লুকি চালের দিন। ঠগী আর পিণ্ডারীর অত্যাচারে থরোথরো বুক মুসাফির, তীর্থ ও হজ যাত্রী। উটের পিঠে ইস্তাম্বুলী কার্পেট চাপিয়ে বেদুইনী পোশাক-পরা আরবী সওদাগর, পিতলের তাজামে বসে মিছরী আর ফল বিতরণে পুণ্যার্জনে ব্যস্ত প্রসন্ন সহাসনয়না রাজপুতানী, তাদের দিন চলে যাচ্ছে। পৌঁছে গেছে নতুন মানুষ। হিন্দুস্থান তাদের। হিন্দুস্থানের কোটি কোটি মানুষ তাদের প্রজা। ফৌজ তাদের প্রয়োজনের হাতিয়ার।

এক রাত্তিরে চলে গেল আনোয়ার। গেল দুরাশায় বুক বেঁধে। পরীর কাকুতি মিনতি, খুদাবক্সের চোদ্দবছরের জীবনের ভালোমন্দের ভাবনা, এই সব চিন্তা থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করল সে।

নাম লেখাতে গেল যে মানুষ সে আর ফেরে না। আজ গেল, কাল গেল, দশটা দিন কেটে গেল, তার দেখা নেই। পরী শুধু দোয়াভিক্ষা করে। কোন্ আসমানে বসে আছে খোদা তার কানে যায় না।

খবর এল মাঝরাতে। কার সাড়া পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল পরীর। দোর ঠেলছে কে? কোন জানোয়ার নয়তো? ভাল্লাখানা টেনে নিল পরী। তখন আনোয়ারের গলা শোনা গেল—পরী, পরী.....

দোর খুলে আনোয়ারকে দেখে পরীর অবাক। পা থেকে হাঁটু অবধি কাদা আর রক্ত। ধূলি ধূসরিত দেহ। ত্রস্ত চাহনী।

—কি হয়েছে?

মস্ত অপরাধ করেছে আনোয়ার। ফৌজ থেকে পালিয়েছে। তার চেয়ে বড় অপরাধ ফৌজের দফ্তরে নেই। জাফর আর হবিব-ও পালিয়েছে। তারাও তার সঙ্গে ছিল।

চৌকীতে বসল আনোয়ার। ভাঙা জবানীতে ব'লে গেল গত ক'দিনের ঘটনা। সরকারী কাগজে যখন টিপছাপ দিল অন্য সকলে, একা আনোয়ার নাম সই করল উর্দুতে। সাহেব খুসী হয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন লেখাপড়া যখন জানে তখন তার উন্নতি তাড়াতাড়িই হবে।

তারপর দেখা গেল তাদের গতিবিধির ওপর সাহেবদের কড়া নজর। সকলেরই মনে প্রশ্ন জাগল—নজর কেন? সন্ধে নাগাদ আসল খবর ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। তাদের সুদূর পাঞ্জাবে যেতে হবে। খবর পাওয়া গেল কিছু বরখাস্ত সিপাহীর কাছ থেকে। এই নতুন আমদানী-ফৌজের সঙ্গে যাতে তারা না মিশতে পারে সেদিকে সাহেবদের কড়ানজর ছিল, তবু খবরটা রোখা গেল না। জানা গেল টিপছাপ দিয়েছে যে সর্তে, তাতে নাকি হিন্দুস্থানের সর্বত্র বিনা আপত্তিতে যাবার কথা বিশেষ ক'রে লেখা ছিল।

—একথা ত' নওলপ্রসাদ বলেনি?

—বলবে কেন? সে সাহেবদেরই লোক। ফৌজের জন্যে সিপাহী জোগাড় করাই তার পেশা। কিন্তু বেইমানী করে নওল-ও পার পায়নি। পিঠ সোজা করে দাঁড়াল আনোয়ার। চালাঘরখানাতে তাকে আর ধরছে না এমনই বিরাট মনে হচ্ছে তাকে। সে বলল,—সে বেইমানকে আমি খতম ক'রে দিয়েছি। ছোরাখানা তার বুকের এদিক ওদিক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। দুনিয়ার আলোতে তাকে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না। তাকে খুন ক'রে তবে আমরা

পালিয়েছি। ফৌজ আমাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছে।

তারপর বলল,—তারা তিনদিন ধরে পালাচ্ছে। রাতে রাতে গা ঢাকা দিয়ে পথ চলে চলে এতদূর এসেছে। বড় বিপদ সামনে। সে-বিপদের চেহারা সে জানে না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছে যে তাকে এখনি পালাতে হবে।

—কতদিনের জন্যে?

—তা সে বলতে পারে না। হবে মাস কয়েকের জন্যে।

—তবে আজ রাতে বিঠোলীতে এল কেন আনোয়ার? বিঠোলী ত বড়রাস্তার ওপরেই। গতবছরই কানাত পড়েছিল বিঠোলীর পাশে—শিকার করতে এসেছিল মিলিটারী সাহেব। যার মেম ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত!

সে-সব কথা আনোয়ারও জানে। জাফর আর হবিব গাঁয়ের কাছে আসেনি। রাতারাতি যমুনা পেরিয়ে তারা সাসারামের পথ ধরবে। সে একা এসেছে। পরী আর খুদাবক্সকে একবার না দেখে চলে যেতে তার মন সরছিল না।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনেই কেমন যেন ভাষাহারা হ'য়ে গেল। হঠাৎ সমস্যা ফেনিয়ে উঠল নতুন ক'রে। নতুন প্রশ্ন দেখা দিল। সহজ নিরুদ্বেগ জীবনের সাধারণ সুখদুঃখের প্রশ্নগুলো বাতিল হ'য়ে গেল। সেই পরী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যার রূপ গুণ অনেকের চেয়েই খাটো বলে সে জেনে এসেছে এতদিন। আতি সহজে সে গ্রহণ করেছে পরীর সেবাযত্ন। দিনের পর দিন দুইখানি নিরলস হাতে পরী তার ঘরের কাজ করেছে, ছেলেকে দেখেছে, চাপাটি সেঁকে ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে তাকে ফসল কাটার মৌশুমে। রাত জেগে বাতির সামনে ব'সে কাপড় রিপু করেছে, টুপিতে তালি দিয়েছে, নয়তো পরবের দিনে পরবার জন্য নিপুণ হাতে লাল রেশমের কুর্তায় সলমা চুমকি বসিয়েছে সযত্নে।

আজ এতবছর পরে যেন আনোয়ারের চোখে পড়ল পরীর চেহারায় সে লাবণ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, কপালে রেখা পড়েছে, চুল পাতলা হয়ে এসেছে, হাত দুখানায় অনেক পরিশ্রমের স্বাক্ষর। তবু এই নারীর সঙ্গেই তার জীবন জড়ানো আর একে ছেড়ে যেতে হবে ব'লেই তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

মুহূর্তগুলির বিহ্বলতা কাটিয়ে পরী বলল,—জল এনে দিই, হাত পা মুখ ধোও।

—সময় নেই পরী।

—একটু কিছু খাবে না?

—সময় নেই।

কেন সময় হবে না? এতটুকু বিশ্রাম করবে না, একটু কিছু খাবে না, এ কি রকম বিদায় গ্রহণ আনোয়ারের? তিন বছর ধরে উপোসের কষ্ট অনেক জেনেছে পরী। দেখেছে, তারা যখন উপোষ করেছে, তখনও গাঁয়ের কোন কোন ঘরে সমারোহ করে দশেরা আর রামনবমী হয়েছে। ঈদ আর সবেবরাতে কোন কোন বাড়িতে ধূমধাম হয়েছে। বাজী পুড়েছে, নতুন কাপড়ের সওগাত আর নানা রকম মিঠাই এসেছে সহর থেকে রঙীন কাগজ ঢাকা ঝুড়ি বোঝাই হ'য়ে। সে সব দিনে এই স্বামীই তাকে কত অপমান করেছে। খাবারের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কথায় কথায় মেরেছে ছেলেটাকে। সন্ধ্যেবেলা জল আনতে গেলে লালাদের বুড়ী দাদী দরদীর মত স্পর্শ বাঁচিয়ে আটা ঢেলে দিয়েছে তার আঁচলে, আর তাই জানতে পেরে আনোয়ার গালাগাল করেছে।

তবু এ দুঃখ-ও দুঃখ নয়, এই মনে ভেবে সুদিনের ভরসায় বুক বেঁধেছিল পরী।

যাই হোক না কেন, মরদ ত ঘরেই আছে। এতদিনে সেই ভরসা তার চলে যায় বুঝি। নিরাশ্রয় হবে পরী আর খুদাবক্স্, বেঁচে থাকবে পরের দোয়া ভিক্ষা করে।

স্বামীর হাঁটুতে মাথা রেখে মাটিতে বসে কাঁদতে আরম্ভ করল পরী। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার দমকে শরীরটা তার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। তখন নীচু হয়ে তাকে তুলতে গিয়ে সেই মাটিতেই ব'সে পড়ল আনোয়ার। পরীকে টেনে নিল কাছে।

জানলা দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছে ঘরে। ভাঙাঘরে চাঁদের আলো। সেই আলোতে কতক্ষণ ধ'রে যে বৌ-কে দেখল আনোয়ার! তামাটে লাল মুখ পরীর। বেণীর সামনে গোছা ধরা রুক্ষ চুল। কবে সাদী হয়েছিল তখন এমন করে টান অনুভব করেনি সে। অনেক গলতি জমেছিল পরীর কাছে। তাই বুঝি এই রাতটাকে মিলিয়ে দিয়েছে খোদা।

চাঁদ যখন হেলে পড়েছে তখনো ঘুমন্ত আনোয়ারের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল পরী। স্বামী বলেছে—তুলে দিবি আমাকে। আঁধারে আঁধারে চলে যাব। বললেই কি সে ঘুম ভাঙাতে পারে? এখনও ত রাত রয়েছে। নিজেও হেলান দিল পরী।

সেই ঘুম না ভাঙলেই বুঝি ভাল ছিল। ভাঙল রোদের তাপে, ঘোড়ার পায়ের শব্দে আর দশজন মানুষের গলার উল্লাসের চীৎকারে।

সব বুঝে লাফিয়ে উঠে আনোয়ার খুলে নিল তার ছোরা। বেরিয়ে আসতে না আসতে চীৎকার করে উঠল ফিরিঙ্গী অফিসার। পরী কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরল তার স্বামীকে। এক ঝট্‌কায় পরীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আনোয়ার চেঁচিয়ে উঠল,—চলে আয় কে মরদ্ আছিস্!

সমস্ত শরীরটা ফুলে উঠল তার। আগুন জ্বলতে লাগল চোখে। এই মানুষকে চেনে না পরী। অনেকদিন আগে আনোয়ারের বাপ বাঘের সঙ্গে মৌকা নিত। আজ আনোয়ারের রক্ত সেই কথা স্মরণ করেছে। তার রক্তেও জ্বালা ধরেছে।

কাঁটার ঝোপ, শুক্‌নো নালা, গমের ক্ষেত বনজঙ্গল, আঁধারে আঁধারে সেইসব পেরিয়ে ডেভিড্‌সন আজ তিনরাত ধ'রে তিনটে নেটিভ বদমায়েসের খোঁজে খোঁজে আসছে। তিনটের বদলে দশটাকে লটকে দিলেই হ'ত, কিন্তু জোনাস্ সাহেব ক্ষেপে আছে। সেই তিনটেকেই চাই। এই লোকটাই নাকি দলের সর্দার, সবাই তাই বলছে। আনোয়ারকে দেখেই জঘন্য একটা গালি দিয়ে বন্দুক তুলে ধরল সে।

আনোয়ারের ছোরাখানা ততক্ষণে অব্যর্থ লক্ষ্যে গেঁথে বসেছে সবচেয়ে সামনের সিপাহীটার গলায়। ভাল্লাটা হাতে ধরিয়ে দিল খুদাবক্স্। কিন্তু প্রতিপক্ষকে ফিরে আঘাত হানবার দ্বিতীয় সুযোগ মিল্‌ল না তার। ডেভিড্‌সনের গুলি তার আগেই বুকে বিঁধে গেল।

সকালের প্রশান্তি টুটে ছিঁড়ে ফেলে পরী আর খুদাবক্সের আর্তনাদ ফেটে পড়ল। আনোয়ারের জোয়ান দেহটার ওপর দিয়ে সারিসারি চলে গেল ঘোড়াগুলো। ছিট্‌কে পড়ল আনোয়ারের বিশাল দেহ। রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল ধুলোর ওপর।

ততক্ষণে বিপদের সঙ্কেত পৌঁছে গেছে গ্রামের ঘরে ঘরে। সবচেয়ে আগে ছুটে এল গ্রামের মদনমোহনের সেবাইত পরমেশ্বর মিশ্র। বলিষ্ঠ বাহুতে তুলে ধরল আনোয়ারের মাথা, হাফিজ ধরল পা। চারপাইটা টেনে এনে গায়ের চাদরখানা তাতে ফেলে দিল বুড়ো লালা।

জলের ঝাপটা দিতে দিতে জমি ভিজে গেল, কিন্তু চাদরটার বাঁধন না মেনে রক্ত উঠতে

লাগল ঝলকে ঝলকে। কিছুক্ষণ বাদে চোখ খুল্‌ল আনোয়ার আর খুদাবক্স্ ঝুঁকে পড়ল সামনে।

কি বলতে চাইছে তাকে আব্বা। ঠোঁট নড়ছে অল্প অল্প। কান পাতল খুদাবক্স্।

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে নিচু, ভাঙা, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে আনোয়ার বলল,—বেটা বেটা লাল!

—আব্বাজান!

—তুই বদলা নিস্...আমায় খুন করল...ভুলিস্ না!

—কভি নহি আব্বা!

—ভুল্‌না মৎ!

কথাটা প্রায় জোরে বলল আনোয়ার। মৃত্যুর আক্ষেপে অস্থির আঙুলে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল বাঁধন। দু'টো তিনটে ধারায় ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত উঠে এল। সমস্ত শরীরটা থর থর ক'রে কেঁপে স্থির হ'য়ে গেল।

পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল খুদাবক্স পিতার বুকে। পরী তখনো অচৈতন্য।

সে রাত ধরে ভীড় লেগেই রইল বাড়ির উঠোনে। গোর-কাফনের বন্দোবস্ত তৈরী, মৌলভী সাহেব ফাতেহা পড়লেই হয়। মৌকা বুঝে বেঁকে বসল মৌলভী। বলল,—আমার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছে সে? অপমান করেছে গোঁয়ার্তুমি করে।

মৌলভীর জবাব শুনে গোঁয়ার হাফিজ গিয়েছে, শাসিয়ে এসেছে মৌলভীকে চড়া গলায়। ঘর পুড়িয়ে দেবে, ক্ষেত লুঠে নেবে, এই সব শাসানি শুনে মৌলভী সাহেব এসেছেন শেষ পর্যন্ত।

নিজের বোনা আমগাছের তলায় গোর দেওয়া হলো আনোয়ারকে।

খবর পেয়ে ভোরের দিকে মোষের গাড়ি হাঁকিয়ে এল পরীর চাচা। সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—আমার কাছে চল্ বেটি, দু'জনে থাকব।

খুদাবক্স্-ও নানার কথায় সায় দিল। বলল,—আমি ত বেরিয়ে যাব, তুই কার কাছে থাকবি মা? নানার কাছেই যা।

পরী ছেলেকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। কিন্তু অনমনীয় সংকল্পে ঘাড় বাঁকিয়ে রইল ছেলে। সে যে বাপের যোগ্য সন্তান, তার প্রমাণ তাকে দিতেই হবে। নইলে উঠোনের কবরের দিকে সে কেমন ক'রে চাইবে? বাপকে মনে মনে কি জবাবদিহি করবে? বাপের কথা, বাপের চাহনি তার মনে নিরন্তর চাবুক মারছে। তার পক্ষে ঘরে থাকা অসম্ভব। সে চলে যাবে দূরদূরান্তে।

অগ্নিশিখার মত পবিত্র, উজ্জ্বল সেই কিশোর মুখ। পরী সেদিকে চেয়ে কেঁদে উঠল,—ওরে তুই কি করবি?

—পাঠান কখনো চিন্তা করে না মা। হিম্মৎ থাকলে আপনি থেকে রুজী এসে ধরা দেয়।

আনোয়ার থাকলে যেমন করে বোঝাত, ঠিক তেমনি ক'রে পরীকে বোঝাল খুদাবক্স্। পরী বলল,—বেশ। আমি কিন্তু এ-ভিটে ছেড়ে নড়ব না। ঘরে চেরাগ দেবে কে?

খুদাবক্সকে বোঝাতে এল পড়শীরা। হাফিজ, সজ্জন, বিষাণ সিং, লালা। সবাই বলল, তাদের ভরসায় পরী থাকুক। তারা খেয়ে পরে বেঁচে থাকলে পরীর-ও কোন অভাব হবে না।

খুদাবক্সকে নিয়ে যাবে নন্দলাল। আনোয়ারের বাল্যবন্ধু সে। রাত জেগে ছেলের

জামাকাপড় রিপু করল পরী। গুছিয়ে বেঁধে দিল পোঁটলা করে। কোমরে দিল বাপের ছোরাখানা।

রওনা হবার সময় ভোররাতে। ডাকতে এল নন্দলাল। নদীতে খেয়া নৌকো চলেছে ভেসে। ঝাপ্‌সা চোখে খুদাবক্স্‌ দেখতে লাগল মা-কে। অর্জুন গাছের ডাল ধরে কপালে হাত দিয়ে সে চেয়ে আছে, সে যেন শুধু তার মা-ই নয়। সে যেন তার গ্রামখানি। গ্রামখানাই যেন তাকে বিদায় দিতে এসেছে ভোরবেলা।

নৌকো ওপারে ঘাটে পৌঁছতে সে পা দিল নতুন মাটিতে—নতুন জীবনে।

পাঁচ

প্রায় পনেরো দিন ধরে পথ চলল নন্দলাল আর খুদাবক্স্‌। পথে পথে সরাইখানা। পথচলতি বন্ধুদের বিশ্বাস করতে নেই। ঠগীদের অত্যাচার বন্ধ হয়েছে কিন্তু ডাকাত খুনে আর বাটপাড়ের ভয় পদে পদে।

বান্দাতে পৌঁছে কৈন নদীর তীরে খুদাবক্সুকে আশ্চর্য সব জিনিষ দেখাল নন্দলাল। বলল,—নদীর মাঝখানে যে লাল সবুজ আর গেরুয়া রঙের পাথর দেখছিস না, ওর প্রত্যেকটি মন্তর পড়া। দেখবি? কথাটা শেষ করেই সে আছড়ে একটা ছোট পাথর ভেঙে ফেলল। তার মধ্যে সত্যি সত্যিই সব চিত্রবিচিত্রিত রেখা। মঞ্জুল ভঙ্গীতে লীলায়িত কোন নৃত্যপরা রমণীর ছবি, কোনটায় অরণ্যের ওপর পূর্ণচন্দ্রের প্রহরার চিত্র। নন্দলাল বলল,—কৈন নদীতে পূর্ণিমা তিথিতে নেমে আসেন স্বয়ং চন্দ্রদেব। জলের জিনপরীদের সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণ লীলাখেলা করে চলে যান। অরা সেই কারণেই পাথরে ছবি পড়ে যায় এমনিধারা। এমনি সব আশ্চর্য রূপকথার গল্প বলে তাকে ভুলিয়ে রাখল নন্দলাল। মানুষবাঘের কথা, বান্দার রাজার মন্তর পড়া পোষা কুমীরের কথা, এমনি সব গল্পকাহিনী।

হামীরপুর, বান্দা আর ছত্তরপুর পেরিয়ে পনেরোদিন বাদে তারা অরছায় এসে পৌঁছল। সন্ধ্যার দিকে সারা শহর ঢুঁড়ে নন্দলাল টিকমগড়ে তার বন্ধু পরন্তপের ডেরা খুঁজে বার করল।

বিরাটকায় চওড়া চেহারা পরন্তপের। জোড়া গোঁফ চুমরে উঠে গেছে কানের পাশ দিয়ে। পরনে যোধপুরী আর পায়ে পেতলের ফুল বসান নাগরা জুতো।

প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর হো হো করে ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হাসতে লাগল পরন্তপ। বলল,—আরে মুসলমান পাঠানকে আমি ছোঁব? খুদাবক্সের দিকে ঢালের মত হাতখানা এগিয়ে ধরে বলল,—একবার পাঞ্জা লড়ে যাও বেটা, দেখি এলেম্‌?

নন্দলাল বলে,—কি জী, চাকরী ছেড়ে দিলে কেন সরকারের?

পরন্তপ ভ্রূকুটি করে বলে,—আরে ভাই চৌহান কখনও নোকরী করে? চাকরী কি?—দুবেলা শুধু লেফট্‌ রাইট্‌, লেফট্‌ রাইট্‌, পরেড্‌ লাগাও উর্দি পরো,—আর ঐ গোঁয়ার শুয়োর-খেকো ফিরিংগী বলে কিনা, ষ্টেন্‌সান! তিন মাস চালালাম ভাই, তার পর একদিন কৌড়ি গাছের ফল খেয়ে খুব বমি করলাম। সাহেব ডাক্তার বলল, হাজা হ'য়ে গেছে, একে ছুটী দিয়ে দাও নয়ত ছাউনীতে মড়ক লাগবে।—আরে ভাই চৌহান কভি কাম করতা? আবার হো হো করে হাসতে লাগল পরন্তপ। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল,—আর কাজ যে করব, সে কার জন্যে? বৌ সেই উদয়পুরের কাছে তার মোষ নিয়ে পড়ে আছে।

আমাকে ছেড়ে দেবে তবু চারটে মোষের মায়া ছেড়ে আসবে না। ছেলেটাকে সাদি করালাম তা এমনি নসিব যে বৌ তাকে মন্তর করে বশ করে নিল। তব বোল ভাই খাঁ সাহেব কার জন্যে মান ছোট করব? কোই শের হ্যায় যার নোকর হব আমি? বলেই, আবার সেই হাসি। পরন্তপ বলে যায়,—ভাই খাঁ সাহেব খুদাবক্স্‌, এসব তুমিও একদিন বলবে, তবে আমার মত বুড়ো হ'লে। এখন তোমার শেখবার সময়, খাটবার সময়, লড়বার সময়। পুরুষের ত হিম্মত-ই বল, হিম্মত-ই মরদান, হারায়া দরদ—।

নিঃশব্দে হাসতে লাগল নন্দলাল। বলল,—কথায় কথায় শের বলবার অভ্যাসটা দেখছি আজও তোমার রয়ে গেছে!

পরন্তপ বলল,—নিশ্চয় নিশ্চয়—মসল্ল-ই—মরাফ পরায়া য়ে জবান্‌ না—। শেরত কথার গহনা। ও তো পরাতেই হবে।

পরদিন সকালে খুদাবক্সকে স্নান করিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে জামাজোড় পরিয়ে নিয়ে গেল পরন্তপ অর্জুন সিং পওয়ারের কাছে। অর্জুন সিং-এর বাড়িতে সেদিন তুলসী শালগ্রামের বিবাহ। বড় ভাঁড় আর জোর খাওয়া-দাওয়া।

অর্জুন সিং-কে দেখেই হাসতে হাসতে গালাগালি করে সম্ভাষণ সুরু করল পরন্তপ, আরে লুটেরা, আরে ডাকু, আরে পওয়ারের বেটা, আতর গুলাব নিয়ে আয়, আদর যত্ন কর, পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া, বসা,—দেখ তোর জন্যে কি এনেছি!

দুই জোয়ানে জাপটাজাপটি কোলাকুলি করে সম্ভাষণ হল। তার পর খুদাবক্সকে পরন্তপ বলল,—সেলাম লাগাও বেটা, এখানেই তোমার কাজ মিলে গেল। বন্দুক ছুঁড়বে, ঘোড়া চড়বে, তরোয়াল চালাবে, এইসব শিখবে। দেখো ভাই অর্জুন, যা শেখবার তাই শিখিও, তোমাদের আবার নিজের মত কতকগুলো খেলা আছে, সেগুলো যেন শিখিও না।

গোপন কথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে, অস্বস্তি বোধ করে অর্জুন। বলে,—কি যে বল তুমি! সে সব যা হবার হয়ে গেছে।

পরন্তপ হাসতে হাসতে বলল,—যা করতে হয় সামলে কর, তোমাদের আবার অভ্যেস হয়ে গেছে কিনা, তাই মুস্কিল! রাজপুত সর্দার, লড়াই কর, খেতী করাও, শিকার খেল; তা না হাজার রকম চোরা কাজ করবে আর লুঠ করবে, এ সব কি কখনো রাজপুতের কাজ?

অর্জুন সিং মাথা নেড়ে বলল,—না না আমি ফৌজ বানাতে চাই। রাজার মোহর মিলেছে। তিন শ' ফৌজ আমি রাখব। লোক খুঁজছি সেই জন্যে।

কাজ হয়ে গেল খুদাবক্সের।

পাঁচ বছর ধরে শুধু নবীশ রইল খুদাবক্স্‌। তন্‌খা মিলল না তার। মিলল শুধু ঘোড়া বন্দুক আর তলোয়ার। রাজপুত ছেলে প্রতাপের সঙ্গে তার ভারী মিলমিশ হয়ে গেল। সারাদিন হাজারটা কাজ। হাজারো ব্যাপারে সাগরেদী করাই হচ্ছে ছোটদের কাজ। তা'ছাড়া ঘোড়াকে যত্ন করা, তাকে পোষমানানো, ডলাইমলাই—সবই শিখবার জিনিষ।

কিন্তু কেমন যেন একটা রহস্যও আছে। মাঝে মাঝে যখন সরকারী তহশীলদার খাজনা নিতে আসে, তখন খাওয়াদাওয়ার ধুম পড়ে যায়। নাচওয়ালী এসে নাচে। তার জুড়ি সঙ্গত লাগায়। সে আসরে তাদের সবার ডাক পড়ে। শুধু কখনো যদি রাতে খবর আনে দূত, তখন রাতারাতি দশ বারোজন ঘোড়াসওয়ার ছুটে বেরিয়ে যায়। কখনো বিশ পঁচিশ চল্লিশজনও যায়। রাত্তিতে যায় আবার ভোর না হতেই ফিরে আসে ঘোড়ার পিঠে

থলি বেঁধে, জামায় রক্তের দাগ লাগিয়ে। মালিকের সঙ্গে তখন তাদের কথাবার্তা হয় দোর বন্ধ ক'রে ফিসফিসিয়ে।

কি করতে যায় ওরা,—এই প্রশ্ন ক'রে একদিন ধমক খেল খুদাবক্স্। গর্জন সিং ডেকে এনে খুব কষে ডেঁটে দিল। বিশ্রী একটা গাল খেয়ে অপমানে চোখ জ্বলে উঠল তার। বলল,—খবরদার! আমি পাঠানের বাচ্চা, মনে রাখবে।

গর্জন সিং বলল,—কি করবি তুই? শির নিবি?

নিলে নিতে পারতো মাথা, এমনই খুন চেপে গিয়েছিল খুদাবক্সের। কিন্তু তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নিয়ে গেল প্রতাপ। ভুলিয়ে-ভালিয়ে বলল,—ভালুকের বাচ্চা ধরেছে জালিম, দেখবি চল।

প্রতাপ ভালুকের বাচ্চা দেখাবে বলে খুদাবক্সকে অনেক দূরে নিয়ে গেল; বেতোয়ার ক্ষীণধারা পেরিয়ে যেখানে বালির মস্ত চরটা এক প্রান্তে জঙ্গল ছুঁয়েছে। সেইখানে পৌঁছে একখানা বড় পাথর দেখিয়ে বলল,—বোস!

—না বস্‌বে না, কৈ কোথায় জলিম!

—জালিম হাটে গেছে আজ! বস না তুই!

প্রতাপের অনুরোধে শান্ত হয়ে বসল খুদাবক্স্।

সামনের দৃশ্য যেমন শান্ত, তেমনই সুন্দর। সাদা সাদা বালি চিক্ চিক্ করতে করতে হঠাৎ আলোয় ঝলকে উঠছে দূরান্তে। মাঝখানে ক্ষীণ অথচ স্বচ্ছ জলের ধারা বয়ে গেছে। বালির ওপর পায়ের দাগে দাগে রাস্তা হয়ে গেছে। প্রতিদিন এখানে সকাল ও সন্ধ্যায় গাঁয়ের মেয়েরা ঝক্‌ঝকে পেতলের কলসী একটার উপর একটা সাজিয়ে বিচিত্র রংয়ের ঘাঘ্‌রা দুলিয়ে জল নিতে আসে। কেউ সঙ্গে আনে হাত ধরে ধরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, ভাইবোন। জল কম নদীতে, তাই বিপদ তেমন কিছু নেই। এখন দুপুর, কাছেপিঠে কেউ কোথাও নেই। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। বাতাসে থেকে থেকে চাবুকের শিষ শোনা যাচ্ছে। তৃষ্ণার্ত একটা কুকুর শরীর ডুবিয়ে জল খাচ্ছে নদীতে, আর লালচে হলুদ ডানায় জল ঝাপটে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উঠছে আর নামছে একটা হাঁরামন পাখী। মস্ত ঠোঁট গলায় গুঁজে বসে আছে একজোড়া কাঁকপাখী। চোখ এক চুল ফাঁক করে ওরা নদীতে ছোট ছোট রুপোলী মাছের গতিবিধি লক্ষ করছে। জামগাছটার ডাল বেয়ে উঠছে আর নামছে কাঠবেড়ালী।

রোদ হেলে পড়েছে। এই অপূর্ব পরিবেশে যা বলে গেল প্রতাপ, তা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি ভয়াবহ। খুদাবক্স এক দৃষ্টে চেয়ে রইল আর বন্ধু বলে চলল,—অনেকদিন আগে, অর্জুনের মত সব পওয়ার সর্দাররা 'ভূঁইয়াবৎ' করেছে মারাঠা রাজার বিরুদ্ধে। 'ভূঁইয়াবৎ' বলতে বোঝায় জমির জন্যে লড়াই, কিন্তু পওয়ার সর্দারদের স্বেচ্ছাচারী অভিযানগুলো ছিল লুঠেপাট, খুনজখমেরই নামান্তর মাত্র। চূড়ান্ত অরাজকতা সৃষ্টি করে এরা নিজেদের গোলা বোঝাই করত। আজ আর তারা 'ভূঁইয়াবৎ' করে না বটে, কিন্তু অর্জুনের পুরোন দল আজও ভাঙেনি। এদের মধ্যে অনেকেই পুরোন ঠগী বা পিণ্ডারী। লুঠেতরাজে ওস্তাদ। সরকারী ডাক, খাজনা লুঠ করে এরা। আগ্রা-সাগর সড়ক ধরে যে যাত্রীরা যায়, তাদের সুবিধেমত খুনজখম করে এরা লুঠে আনে সোনারুপো। এইসব কথা যে তোকে বলেছি, তা যেন বেরিয়ে না পড়ে। তাহ'লে ওরা আমাকে খতম ক'রে দেবে। ক'দিন থেকেই বুঝতে পারছি, এবার তোকে নিয়ে এরা বেরুবে।

শুনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল খুদাবক্স। তারপর প্রতাপের কাঁধে হাত রেখে

বলল,—সমঝে দিয়ে দোস্তের কাজ করেছ।

দুই বন্ধু মহল্লায় ফেরবার পথে ঘোড়া ছুটিয়ে অরছা'র লোককে আসতে দেখল। অর্জুন সিং নিজে এসে নিয়ে গেল তাদের। প্রতাপ নীচু গলায় বলল,—অরছাতে এদের অনেক লোক আছে। প্রায়ই খবর দেয় তারা। দো লুঠেরা চাচেরা ভাই। আজ রাতে একটা কিছু হবে।

সন্ধ্যেরাতে ডাক পড়ল খুদাবক্সের। অর্জুন সিং বলল,—আজ রাতে শিকার খেলতে যাবে সব। তুমি গর্জন সিং-এর কাছে থেকো। সে যা বলে তাই শুনবে।

সেই রাতের কথা পরে যখন খুদাবক্স্ স্মরণ করেছে, তখন শুধু লজ্জাই পেয়েছে, নিজের বিবেকের কাছে মাথাটা নিচু হয়ে গেছে। বড় লজ্জার আর কলঙ্কের স্মৃতি সিঞ্চিত সেই রাত।

সেই রাতে তারা ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিল বড়োয়া সাগরের দিকে। হাজারটা প্রশ্নের জবাবেও গর্জন সিং, মহব্বৎ বা শান্তিপ্রসাদ তাকে কিছু বলেনি। আবছা তারার আলোয় এদিক ওদিক নজর রেখে ধূর্ত নেকড়েবাঘের মত জ্বল্‌জ্বলে চোখে তারা এগোচ্ছিল। দূর থেকে কয়েকটা টিম্‌টিমে আলো চোখে পড়তেই তারা সেই দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল।

অজানা উত্তেজনায় বুক কাঁপছিল খুদাবক্সের। নাঙ্গা তরোয়াল হাতে তার সঙ্গীরা যখন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত নিদ্রায় শায়িত কয়জন যাত্রীর উপর তখন সে কিছুতেই এগোতে পারেনি। আর্ত নারীকণ্ঠের ক্রন্দন, শিশুর ভয়াতুর আর্তনাদ আর গর্জন সিং-এর ছোরার আঘাতে পুরুষ কণ্ঠের যন্ত্রণার চীৎকার তাকে বিদ্যুতের কশাঘাত করেছিল। গাছের ডালে ঝুলোনো বাতির আলোতে তার সঙ্গীদের দেখাচ্ছিল যেন যমদূতের মত। খুনী! বেইমান! বলে সে সজোরে আঘাত করেছিল শান্তিপ্রসাদের হাতে। সুজন সিংহের হাতে চোট মেরে ফেলে দিয়েছিল তরবারি।

—ওরে বেওয়াকুফ! পাঠানের কলঙ্ক! বলে তাকে পাল্‌টা মেরেছিল গর্জন সিং। খুন চেপে গিয়েছিল খুদাবক্সের মাথায়। অসম সাহসে সে লড়েছিল তার চারজন সঙ্গীর বিরুদ্ধে। দূর থেকে শোনা গিয়েছিল কার পুরুষ কণ্ঠের হুঙ্কার—কো...ন্...হ্যা...য়.....

অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গিয়েছিল। মশালের আলো কাছে আসছিল, আঁধারের বুকে নাচ্‌তে নাচ্‌তে। গর্জন সিং শ্বাপদের মত দাঁত ঝল্‌কে বলেছিল,—মর এবার দুশ্‌মনের হাতে। বলে প্রবল বেগে তরোয়াল মেরেছিল তার কাঁধে। লোহার জালে বেধে গিয়েছিল তরোয়াল।

তখন সামনের আঁধার থেকে সাঁই সাঁই করে ছুটে এসেছিল এক ঝাঁক বর্শা। তারই একটা লেগেছিল খুদাবক্সের পায়ে। মাথা টলে পড়ে যেতে যেতে হাজারখানা বর্শার চেয়েও বিদ্ধ করেছিল তাকে বালককণ্ঠের আর্তনাদ—পিতাজী! পিতাজী!—সেই আর্তনাদের সঙ্গে চেতনা হারাতে হারাতে খুদাবক্সের বুক বিদীর্ণ করে একখানা পুরোনো ছবি ভেসে উঠেছিল—মনে পড়েছিল পাঁচ বছর আগেকার এক সকালে সাহেবের ঘোড়ার খুরে খুরে আনোয়ারের জখম দেহ ধাক্কা খাচ্ছে আর তার নিজের কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ উঠে চিরে ফেলেছে আকাশ। অজান্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল—; হায় আল্লা! তার পরই রাশি রাশি আঁধারের বুকে ডুবে গিয়েছিল সে।

জ্ঞান হ'লে, প্রথমে তার মনে হল, যেন অতল আঁধারের বুক থেকে আস্তে আস্তে

উঠছে সে। কে যেন তাকে ঠেলে ধরছে ওপারের দিকে। কে তাকে বলল,—দেখি, মুখ তোল, জল খাও।

কষ্টে চোখ মেলল খুদাবক্স। দেখল দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ দেহ, শ্যামকান্তি এক প্রৌঢ় পাঠান। ঈষৎ রক্তিম দুই চোখে কৌতুক, ক্ষমা আর মমতা নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছেন।

শিশুর মত বিস্ময়ে তাকাল খুদাবক্স তাঁর দিকে। বুঝল সে এক চারপাই-এর ওপর শুয়ে আছে। মাথার ওপর ছাদ। অস্ফুটে কণ্ঠে সে বলল,—পিয়াস।

তার মুখে জল দিলেন তিনি। সে উঠে বসতে চাইতেই তাকে শুইয়ে দিলেন সযত্নে। বললেন,—কি খাঁ সাহেব, একেবারে ঠিক হয়ে গেছ? উঠে বসতে ইচ্ছে করছে?.....সামাদ্! ছুটতে ছুটতে এল গৌরবর্ণ, ছোটোখাটো একজন বৃদ্ধ। পিতলের ঘটিতে কি যেন এনেছে সে। সসম্ভ্রমে বলল—ওস্তাদ!

—আরে কেমন হোঁকিম তুমি? রুগী কি খাবে এখন? নাকি আজও এলাচদানা আর গরমজল? তোমার কেতাব কি বলে?

—আজ দুধ দেব হুজুর। খাস্ বিকানীর মিছরী দিয়ে দুধ জ্বাল দিয়েছি।

কৌতুকভরা চোখে প্রৌঢ়পুরুষ বললেন,—এই জঙ্গলে মহিষ কোথা থেকে পেলে সামাদ? তোমার কেতাবের পাতার মধ্যে বাঁধা ছিল নাকি?

—খাস্ হোঁকিমী কায়দায় মিলল হুজুর। কাল গাঁয়ের তালুকদারকে সাপে কেটেছে। নির্বিষ সাপ। তবু খানিকটা চিকিৎসা করলাম। আজ সকালে এসে বলছে,—হোঁকিম সাহেব, তুমি জমি নাও, বাস করো আমার গাঁয়ে। আমি বললাম জমি নিতে আমার কেতাবে মানা। তখন ফিরে গিয়ে দুধ, মিছরী, দুটো খাসি পাঠিয়ে দিয়েছে।

—বেশ! বেশ! আর কিছু দেয়নিত সামাদ?

—তোবা তোবা, বলে নাক মলল সামাদ। বলল—হুজুর হোঁকিমী ক'রে পয়সা-কড়ি নেওয়াত' আমি ছেড়ে দিয়েছি।

ছোট পেয়ালা করে খুদাবক্সের গলায় দুধ ঢেলে দিল সামাদ। উষ্ণ আরাম খুদাবক্সের সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙল যখন তখন আঁধার। মনে হলো অনেক রাত হয়েছে। তার পাশে বসেছিলেন সেই প্রৌঢ় পুরুষ। বললেন,—কাল থেকে ঘুমোচ্ছ, এবার ওঠ।

তাঁর সাহায্যে উঠে হেলান দিয়ে বসল খুদাবক্স। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন,—শোন, তুমি আমার বন্দী। আমি কে, তা জান? আমি গুলাম ঘোস খাঁ। ঝাঁসীরাজের সর্দার গোলন্দাজ। তারপর কিছুক্ষণ ধ'রে শুধু গালাগালি দিয়ে গেলেন তাকে। বললেন,—পাঠান নামের কলঙ্ক তোমরা। কতকগুলো লুঠেরা ডাকাতের সঙ্গে যোগ দিয়ে লুঠ করছ নিরস্ত্র যাত্রীকে, সেদিন খুন করেছ দুদুটো লোক, একটা বাচ্চা, সরম আসে না মনে? তোমার জান আমি বাঁচিয়েছি বটে কিন্তু এই রকম জান থাকলেই কি, গেলেই বা কি? জান-ই কি সব? হুঁস, মান,—এ সবের কোন দরকার নেই? না কি তুমি বে-হুঁস আর বে-ইমান? এখন তোমাকে যদি ফাঁসিতে লটকাই? গুলী করে মারি? জখম করে জঙ্গলে ফেলে দেই বাঘের মুখে, চাই বেতোয়ার চড়ায় পুঁতে ফেলি? তোমার মনিব তোমাকে বাঁচাবে?

জবান সামাল! আত্মবিস্মৃত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠল খুদাবক্স—খবরদার, সব কথা সত্যি নয়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল নিজের কথা খুদাবক্স।

সব কথা শুনে গুম্ হয়ে রইলেন গোলাম ঘোস। একটু পরে বললেন,—কাজ করবে?

—হ্যাঁ করব।

—বিশ্বাস রাখতে পারবে?

—পরখ করুন!

—বেশ, দেখে নেব আমি। রাজ্যে কিছু বদমায়েস লুঠেরা আছে জানি। প্রায়ই আমাকে টহল দিতে হয়—এখানে সেখানে। শোন, আমার সঙ্গে সাগরেদী করতে হবে তোমাকে কমসে কম তিন বছর। তারপর তোমাকে নিয়ে যাব ঝাঁসী। রাজাকে ভেট লাগাবে, তারপর শহরে থাকবে। বাইশটা কামান আছে আমার তাঁবে, দেখাশুনো খবরদারি করি। সাগরেদী মঞ্জুর করিয়ে দিচ্ছি আমি রাজার মোহর আনিয়ে। পঁচিশ সিক্কা টাকা তলব মিলবে, রাজী?

রাজী খুদাবক্স। উৎসাহে আনন্দে তার হাত থর থর করে কাঁপতে লাগল আর তার মুখ থেকে জীবনে এই প্রথম কৃতজ্ঞতায় নতি স্বীকারের কথা বেরুল,—গরীব পরোয়ার সালামত্, আপকা শির পর সালামত্ রহে।

পরে ফৌজ নিয়ে অর্জুন সিং-এর ডেরায় পৌঁছেছিল ওস্তাদ। পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে খুদাবক্স। কিন্তু পাখী তার আগেই উড়ে গেছে।

এক বিস্তীর্ণ দগ্ধ ছাউনী তাদের চোখে পড়ল। সমস্ত মাল হটিয়ে নিয়ে গোলায় ঘরে আগুন দিয়ে তারা সেই রাতেই পালিয়ে গেছে। কিন্তু প্রতাপ? তার কি হলো?

গ্রামবাসীরা জানাল, প্রতাপের দেহ পরে জঙ্গলে মিলেছিল। লাস দেখে প্রথমটা তারা তাকে চিনতে পারেনি। পরে একটা কবচ দেখে ঐ গাঁয়ের একটা লোক তাকে সনাক্ত করেছিল। অর্জুন সিং-এর দলের লোকরাই খতম করে রেখে গিয়েছিল প্রতাপকে।

সব শুনে গভীর এক মর্মবেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল খুদাবক্স। তারপর দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে প্রিয় বন্ধুর উদ্দেশে। অস্ফুটে বলল,—বদ্‌বখত্!

ওস্তাদের কাছে ছুটি নিয়ে গাঁয়ে ফিরতে ফিরতে খুদাবক্সের অনেকবার মনে হয়েছিল বন্ধুর কথা। ফর্সা লম্বা ছিপছিপে চেহারা, কোমল দেহ আর ঈষৎ ভীরু স্বভাব। কিন্তু সে তাকে ভীষণ ভালবাসত। মা বাপ হারিয়ে রুজীর খাতিরে চাচার দলে যোগ দিয়েছিল প্রতাপ, কিন্তু ঠিক এ পেশা যেন তার নয়। সে কথা বুঝেছিলেন হয়ত খোদাতাল্লা। তাই ঊনিশ বছরেই ডাক পড়ল তার। মৃত্যু এল অতর্কিতে।

মনে মনে স্বার্থপর চিন্তা এল খুদাবক্সের। তার যেন মৃত্যু অমন করে না আনেন খোদা। যেন আসে সামনাসামনি, যেন তাকে চেনা যায়। তার বাপদাদার মত সে-ও যেন তাকে স্পষ্ট দেখতে পায় আর লড়তে পারে।

বিশদিন ধ'রে পথ চলে, বিঠোলীর শিবমন্দিরের ত্রিশূল দেখা গেল। সন্ধ্যারাগে ঝক্‌ঝক্ করছে। নদী পেরিয়ে খেয়াঘাট থেকেই প্রায় ছুটতে লাগল খুদাবক্স। পাঁচ বছর বাদে ফিরছে সে। ধূলো, ঘাস, ক্ষেত আর সেই বাঁধানো কুয়োতলা, সবাই যেন তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

আমগাছের তলায় নিত্যকার মত চেরাগ জেবলে দিয়ে ছেলের জন্যে দোয়া চাইছিল পরী। পাঁচ বছর ধ'রে রাতদিন কেঁদে কেঁদে পরীর চোখের চাহনি ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। একা

ব'সে ছেলের কথা ভেবে ভেবে তার মনটাও হয়েছে পালকের মত হালকা। এক জায়গায় থেমে চিন্তা করে না। হাজারটা চিন্তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেরে। একবার খোদার কাছে প্রার্থনা জানায়, একবার স্বামীর কাছে মনে মনে বলে—কেমন করে যেন দু'টো প্রসঙ্গই এক হয়ে গেছে তার। মনে মনে স্বামীর কাছে অনেক প্রার্থনা জানায় পরী—ছেলে যেন ভালো থাকে, ছেলে যেন সুস্থ থাকে, কোন অমঙ্গল যেন স্পর্শ না করে তাকে। আজ-ও রোজকার মত চেরাগটা নামিয়ে রেখে, দরজায় এসে দাঁড়াল পরী। আবছা আঁধারে ক্ষেতের পথ ধরে কে আসছে? তার স্বামীর মত পরিচিত হাঁটবার ভঙ্গী, তেমনি ক'রে পেছনে ঝাঁকিয়ে কপালের চুল পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে?

তবে খুদাবক্স! সহসা বুকের কাছে হাতটা মুঠো করে চেপে ধরল সে। হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবে বুঝি, এমনই ধড়াস্ ধড়াস্ করছে উত্তেজনায়। দুই হাত মেলে, সদ্যকাটা গমের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে পাগলের মত ছুটে চলল পরী। পাঁচ বছর আগে সাহেবের ঘোড়ার খুরের ধাক্কা লেগে বুক তার জখম। ছেলের কথা ভাবতে গেলেই তাজা খুন উঠে আসে গলাদিয়ে, সে-সব কথা ভুলেই গেল সে। ছুটে চলল বিদ্যুৎবেগে, রুক্ষ চুল উড়ে ঝাপ্‌টাতে লাগল চোখে মুখে।

ছেলের বুকে আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠল পরী, আর মা-কে জড়িয়ে ধূলোর ওপর ব'সে পড়ল খুদাবক্স। দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

সেই নীরব অশ্রুধারায় তর্পণ হলো আনোয়ারের। সন্ধ্যার নীরব প্রশান্তি ভেঙে ডানা ঝাপ্‌টে এক ঝাঁক টিয়াপাখী উঠল আকাশে। এক মুঠো পান্নার টুকরোর মত ছড়িয়ে পড়ল তারা।

ছয়

পলাশে আবীরে মাতাল ভরা ফাল্গুনে হোলির সকাল। কেল্লার ওপরে নহবৎখানায় সানাই ধরেছে রাগ হিন্দোল।

কেল্লার পাশে বড় দরোয়াজা। দুইদিক থেকে লৌহ কপাট সবল হাতে টেনে খুলে মস্ত দু'খানা পাথর গড়িয়ে তাতে ঠেকা দেয়া হলো। দু'জন চোব্‌দার সামনের দিকে আভূমি প্রণত হ'য়ে সেলাম জানাল। প্রভাতসূর্যের রশ্মি এসে পড়েছে ঘোস-এর লাল মুরেঠায়। প্রত্যভিবাদন জানাতে সওয়ারের উষ্ণীষ ঈষৎ টলে গেল চকিতে। তেজে শক্তিতে দুরন্ত ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে শহরে প্রবেশ করলেন গোলাম ঘোস, সঙ্গে খুদাবক্স।

প্রৌঢ় ঘোসের কালো চুলে সামান্য পাক ধরেছে। অন্যথায় শালপ্রাংশু সেই বিশাল দেহের কোথাও এতটুকু চিড় খায়নি। সগর্ব স্নেহে তিনি তাঁর তরুণ সঙ্গীকে পাশাপাশি আগলে নিয়ে চলেছেন, আর মাঝে মাঝে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন।

স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যে খুদাবক্সের চেহারাও তারিফ করবার মত। অবহেলে লাগাম ধরে সে শিশুর কৌতূহলে দশদিক দেখতে দেখতে চলেছে। স্বচ্ছ দুই বড় বড় চোখে শত জিজ্ঞাসা গোলাম ঘোসের মুখ ছুঁয়ে কেল্লার বুরুজে বুরুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বল্প শ্মশ্রু আর পাতলা গোঁফ নওজোয়ান পাঠান যুবকের মুখে বেশ একটা সুডৌল পরিণতি এনেছে। খুদাবক্স আজ খুব খুসী।

নগরীতে আজ হোলির উৎসব। হোলি হ্যায়, হোলি হ্যায়—উত্তাল আনন্দের হররা

উঠছে পথে-ঘাটে, অঙ্গনে, অলিন্দে। খুনখারাবি রং-এর জনস্রোত রাজপথে বাড়ি খেয়ে অলিগলিতে ঢুকে পড়ছে মহা উল্লাসে—

হাসত জনকপুরকে লোঁগ
কব আহিয়ে রাম দেখব ভর নজরি।

দশজন ঘোড়সওয়ার সামনে পেছনে ভাঙ্গা উঁচু করে প্রাসাদের দিক থেকে এগিয়ে এল। মাঝখানে একটি ঝক্‌ঝকে পিতল ও রুপোর কাজ করা তাঞ্জামে আবীর মিষ্টান্ন ও কুঙ্কুমের থালি সাজানো। তাঞ্জাম চলেছে সাহেবের ছাউনীতে, রাজার উপঢৌকন নিয়ে।

ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্,—ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে ভালুক নাচাচ্ছে বাজীওয়ালা। গয়না পরো, গয়না পরো,—ভালুক গহনা পরছে হাতে, গলায়, মাথায়। চলো শ্বশুরাল—ভালুক হেলে-দুলে শ্বশুরবাড়ি চলেছে। বিবি গোঁসা করো, রৌনে লাগ,—অমনি মাটিতে লুটিয়ে মুখ ঘঁসে কাঁদতে লাগল ভালুক, আর উল্লাসে গুঞ্জন করে হাততালি দিয়ে উঠল ছেলে-মেয়েরা।

দেখো বেটা রাণীমহাল। ঘোসের কথায় চমকে তাকায় খুদাবক্স রাণীমহালের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের একতলার জাফরীর ফাঁক দিয়ে কে যেন পিচকিরী ছুড়ল। লালে লাল হয়ে গেল গোলাম ঘোসের শুভ্র পরিচ্ছদ।

আবীর মেখে লাল হয়ে বাহকেরা ব'য়ে আনল কার স্বর্ণখচিত পাল্কী। সম্ভ্রমে জনতা সরে গেল দু'ধারে। গোলাম ঘোস অভিবাদন জানালেন নিচু হ'য়ে। খুদাবক্সকে চাপা গলায় বললেন, বাঈসাহেবা। সসম্ভ্রম ভয়ে মাথা নীচু করল খুদাবক্স।

তাঞ্জামের জরির পর্দা এতটুকু ফাঁক করে ধরে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন রাণী। ইনিই বাঈসাহেবা, মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ। পবিত্র হোলির দিনে লছমীতাল মন্দিরে পূজা দিতে চলেছেন।

এবার হালোয়াই পুরা মহল্লা। পথের দু'পাশে সমৃদ্ধ বিপণি। কিন্তু দোকানপাট আজ সব বন্ধ। কেনাবেচা নেই। রাস্তার দু'ধারে শুধু পত্রপুষ্পের মালা, পথ গুলাল রং-এ পিছল, গোলাপ চন্দনের গন্ধে বাতাস মন্থর।

বুন্দেলা নারীর চলনে ঠমক বেশী। কলহাস্যে তারা চলেছে পদরজে আঁচলে আবীর নিয়ে। মাথায় পুষ্পাভরণ, পীত রেশমের শাড়ী পাক দিয়ে পরে মরাঠা কুলবধূরা পাল্কীতে চলেছেন দাসী নিয়ে। বাজারতলায় ভিড়ের মাঝখানে চীৎকার ক'রে রায়সো গাইছে ছেলেরা। আর হাজারটা মিশ্রিত গোলমাল মন্থন করে থেকে থেকেই ঐকতান ধ্বনি উঠছে,—হোলি হ্যায়, হোলি হ্যায়।

ওস্তাদ বলতে বলতে চলেছেন,—দেখ বেটা ঐ বাগিচা দেখ। আশেপাশে কোথাও তুমি ঝাঁসির মত সুন্দর শহর দেখতে পাবে না। ঐ দেখ, কমলালেবুর বাগান, গুলবাগিচা।

খুদাবক্স দেখে আর মুগ্ধ হয়। ফাগুয়ার রঙ-এ রঙীন হ'য়ে ওঠে তার তাজা মন।

শ্যামবর্ণ চেহারার এক স্থূলকান্তি ব্রাহ্মণ কয়টি কিশোর শ্রোতার সঙ্গে হস্তাপুলির মুদ্রাসহকারে দুরূহ এক তত্ত্বের জট ছাড়াতে ছাড়াতে আসছিলেন। গোলাম ঘোস তাঁকে সম্ভাষণ করেন,—কি শাস্ত্রীজী, হলো কি?

সুপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ প্রত্যভিবাদন করে বলেন,—বড় সমস্যা খাঁ সাহেব, তোমার গোলাগুলীতে এর কোন সমাধান হবে না।

—বলেই দেখন না। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে ঝুঁকে পড়ে ঘোস।

ব্রাহ্মণ হেসে বলেন,—পজনেশ কি কবিতা লিখেছেন খাঁ সাহেব কিছুতেই ছন্দে মিলছে না। তাই ঝগড়া করতে করতে চলেছি—

কোমলতন লালিত নৈন বসত নিশি বাসর মন
প্যারী হমারী লাজ ফুলওয়ারী হ্যায়—

ঘোড়া থামিয়ে গোলাম ঘৌস হাসতে থাকেন। বলেন,—চমৎকার মিলেছে।

—না না এখানে নয়। আগের পয়ারে বলছে,

ভন পজনেশ এক ক্ষত্রাণী সে
হম ভি চুকে—

জাত ব'লেই ত বেমিল করে দিল লোকটা। বুঝছেন না, সন্ধ্যাবেলা শোনাব যখন, রূপা ত কোরিণ কিনা জাতে, কেমন করে বলুন ত মেলাই? বড় সমস্যা খাঁ সাহেব, সে তুমি ঠিক বুঝবে না। তারপর এতদিন কোথায় থাকা হয়েছিল?

—রাজার জন্যে বাঘ পুষেছিলাম।

—তারপর?

—নিয়ে এসেছি।

—শিকারখানার জন্যে ত? তা কি বাঘ? বড় না গুল?

খুদাবক্সের দিকে চেয়ে ঘৌস বললেন,—সেই ত মুস্কিল নারায়ণজী, বুঝতে পারছি না। বাঘের বাচ্চাই হবে। এখন কোন শিকারখানায় যে দেবো—

নারায়ণরাও বললেন,—কপালও করে এসেছিলে খাঁ সাহেব। বাঘ ধরছ, কামান দাগছ, এদিকে পজনেশ যে কি হাঙ্গামা বাধিয়ে রাখল, কি করি বল ত? প্যারী হমারি রূপা কোরিণ হ্যায়, বললে কি আর মেলে? আর লিখলেই হলো? বসে বসে খাতা লিখতিস ইন্দোরে খজুরীবাজারে, সে সব ছেড়ে দিয়ে কবিতা লিখতে গেলি কেন?

চলে গেলেন নারায়ণ শাস্ত্রী। বড় রসিক মানুষ। প্রেমিক স্বভাবের জন্যেই তাঁর নানান সমস্যা। সে সব সমস্যার হাত থেকে তাঁর মুক্তির আশাও নেই। আর মুক্ত অবস্থাটা তাঁর হয়ত খুব পছন্দও নয়।

বেলা বাড়ছে। বাতাস গরম হ'য়ে উঠেছে পথে পথে হোলির কোলাহল উঠছে উন্মত্ত তরঙ্গের মত। চারপাশে গুলাল রঙ, আনন্দের হররা আর রায়সো গানের সুরে ভরপুর। খুদাবক্সের মনেও সেই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগে। ঘোড়ার পিঠে দুলকি চালে চলতে চলতে সে-ও গুণ্-গুণ্ করে গান গাইতে লাগল।

সামনেই এক বিশাল দরওয়াজা। মনের খুসীতে তার ভেতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিতেই সামাল সামাল, হায় হায় করে চেঁচিয়ে উঠল লোকে। কি হয়েছে কিছু বোঝবার আগেই খুদারক্সের ঘোড়া সামনের দু'খানা পা শূন্যে তুলে ঘুরে গিয়ে অতিকষ্টে সামলে নিল, আর সামনে তাঞ্জামসমেত বাহকেরা হুড়মুড় করে পিছু হ'টে গেল। বোঝা গেল, রক্ষে পেয়ে গেল একটি বিপর্যয়।

একটি মাত্র নিমেষ কিন্তু মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডে তার জের কাটতে বহুক্ষণ সময় লাগে। তাঞ্জামের আরোহিণী অস্ফুট আর্তনাদে দু'আঙুলে পর্দা সরালেন। আর সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল খুদাবক্স। দেখল, চাঁদের মত পাণ্ডুর গৌরবর্ণা, ঈষৎ লম্বা মুখে তুলি দিয়ে আঁকা ভ্রূ, রক্তগোলাপে রচিত ওষ্ঠাধর, চম্পকবর্ণ পেশোয়াজে ও ওড়নীতে সেই গৌরতনু বেষ্টিত, কপালে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ বেণীর বন্ধন অমান্য করে ছড়িয়ে পড়েছে। আরোহিণীর

বিস্মিত চোখ খুদাবক্সের চোখে বাঁধা পড়ল। ভ্রূকুটি করলেন তিনি।

চঞ্চল কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু সেই মুহূর্তের একখানি ছবি অনভিজ্ঞ যুবক অশ্বারোহীর মনের পটে অক্ষয় রেখায় ধরা পড়ল। রেখাপাতের সঙ্গে সঙ্গেই পড়ল রঙ। প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠল সেই ছবি।

তাঞ্জামের পর্দা টেনে দিলেন বিজয়িনী। মহাকালের প্রসন্ন দক্ষিণপাণি-বিচ্যুত অমর একটি ক্ষণ নিমেষে ফুরিয়ে গেল। খুদাবক্স অশ্ব সংযত করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। তাঞ্জাম চলে গেল।

সপ্রশংস কণ্ঠে দ্বাররক্ষী বলল,—মোতি! মোতিবাঈ।

মোতি, দুই অক্ষরের একটি নাম বুকে নিয়ে খুদাবক্স সেদিন কেল্লায় ফিরল।

পরে, অনেক পরে, সেই ছবির সঙ্গে উপমা মিলিয়ে অনেক ছবি তার মনে এসেছে। অনেক শের, অনেক 'গুল', অনেক গানের কথাই মনে হয়েছে তার। কিন্তু সেই ছবির পাশে অন্য কোন ছবি তার কাছে সুন্দরতর বলে মনে হয়নি।

সন্ধ্যাবেলা। নাটকশালায় হাজার বাতির ঝাড় জ্বলছে। মেঝেতে লাল গালিচা পাতা, তাতে পা ডুবে যায় চলতে গিয়ে। সামনে সারি সারি কুর্সী বসানো। অনেক সমঝদার লোক বসে অপেক্ষা করছেন। একটু পরে শুরু হবে নাচ গান।

শীষঘরে শিঙ্গার শেষ করে বসেছিল মোতি। মন তার বে-দিশা। অন্যতমা নর্তকী জুহী মোতির পায়ে ঘুঙুর বেঁধে উঠে দাঁড়াল। অন্যদিন মোতি কত কথা কয়। চঞ্চল চোখে ভ্রূভঙ্গিমায় কত নাচের বোল আওড়ায়। কিন্তু আজ মোতি একটা কথাও বলছে না। হাসিখুসী একটা লোক মনমরা হয়ে চুপচাপ থাকবে, জুহীর ভাল লাগে না। বলে,—আকাশ পাতাল কি ভাবছ অমন!

জবাবটা আসে সুগন্ধ বাতাসের ভিজে ঝাপটার মত,—হ্যাঁরে জুহী, আজ সকালে আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল রে!

মোতির কথায় প্রাণ পায় জুহী। তাহলে তেমন কিছুই ব্যাপার নয়। চটুল হেসে বলে,—সখী চুলও বাঁধোনি কাজলও পরোনি; গেলে আর অমনি স্নান সেরে এলে লছমীতাল থেকে। তাই বলি দেখাচ্ছিল যেন ঠিক রাগিণী আসাবরী,

শ্রীখণ্ডে শৈল শিখরে শিখিপুচ্ছ বস্ত্রা
মাতংগমৌক্তিকমনোহরহারবল্লী—

কেন কি হয়েছে? আবার প্রিয় প্রতীক্ষায় চকিতনয়নাও বটে—

—চুপ চুপ। অধরোষ্ঠে অঙ্গুলিশাসনে চুপ করতে বলে মোতি জুহীকে।

জুহী কিন্তু বারণ মানে না। চোখ নাচিয়ে ভ্রূ বাঁকিয়ে বলে,—ফেন চুপ করবো বল? তুমি হলে বুন্দেলখণ্ডের সেরা রূপসী মোতিবাঈ। তোমাকে দেখলেই লোকে চকিত হবে; আর তোমার মন যে পাবে—

অতর্কিতে নাটাশালার দাসী এসে ঢুকল শীষঘরে। হাত নাচিয়ে জানাল আজ বহু সমজদার লোক এসেছে নাচ দেখাতে। সবাই অপেক্ষা করে ব'সে আছে। শিগগির যাও, জলদি কর।

ঘুঙুরের নিক্কণ তুলে হস্তে চলে গেল মোতি। নাটাশালার পর্দা আস্তে আস্তে সরে গেল।

মোতি নয়, শ্রীরাধিকা। মাথায় সোনালী ওড়না, পরনে ঘননীল ঘাগরা। বঙ্কিম ঠমকে কলসী কাঁখে নিঃসীম আঁধারে যমুনায় জল আনতে চলেছেন। রাজভয় আছে লোকভয় আছে, তাছাড়া ঘরে রায়বাঘিনী ননদ,—তাই কুণ্ঠিত ভীরু পদক্ষেপ। গৌর সুন্দর পায়ে রুপোর জিঞ্জিরা ক্ষীণ রেলা তুলে একটি সরল রেখায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে গেল মোতি মঞ্চের মাঝখানে। দুলে উঠল কণ্ঠহার—মতির মালা। মরালগ্রীবা ভঙ্গিময় কর্ণভরণে বিজুরি খেলে গেল। সারেঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে মোতিও পুকার দিয়ে উঠল,...প্রেম সে বাওরী রে...। রাধা ভয়ি প্রেম সে বাওরী—।

কাঁখের কলসী মাটিতে নামিয়ে রেখে গান করতে করতে রূপাতীত লোকে চলে গেল মোতি। মোতি আর এখন মোতিতে নেই।

সারাদিন কোকিল ডেকেছে, আবীর খেলেছে সখীরা। রাধা তখন ঘরে ছিল। প্রিয় তাকে ডাকেনি তাই সে বাইরে আসেনি। এখন এই নিশীথে সে বাঁশী শুনে আকুলপারা বেরিয়ে এসেছে, যমুনার তীরে একা একা পথ খুঁজে ফিরছে। কিন্তু কোথায় তার সেই প্রিয় সখা? তবে কি এই পূর্ণিমারজনী ব্যর্থ হয়ে যাবে? রাধিকার অন্তরে যে আজ অফুরন্ত আবীরের উৎস, কুঙ্কুমের সঞ্চয়! সেই রঙ তার প্রিয় কি গ্রহণ করবে না? তাই মোতি গাইছে;...প্রেম সে বাওরীরে.....।

গানের সুরে সুরে আর নাচের মুদ্রার ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে শুনছিল আর দেখছিল যারা তাদের যেন কোন কল্পলোকে নিয়ে গেল মোতি!

ভাল লাগল সকলেরই কিন্তু পাগল হল এক খুদাবক্স। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল,—বহুৎ খুব!

নাট্যশালায় গণ্যমান্য রাজপুরুষদের সামনে নর্তকীকে বাহবা দেবার রেওয়াজ ছিল না। তাই মোতি নাচ থামিয়ে ঘুরে তাকাল। দেখল, সকালের সেই অশ্বারোহী।

খুব বেমানান হয়ে গেছে মন্তব্য। রাজপুরুষদের সামনে এটা প্রত্যক্ষ বেয়াদবির সামিল। সকলেই খুদাবক্সের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। খুদাবক্সের নাক কান লাল হয়ে উঠল অপমানে। চকিতে সে নাট্যশালা থেকে উঠে চলে গেল। একটু পরেই আবার শুরু হলো নৃত্যগীত, রাজার নির্দেশে।

দোলপূর্ণিমার মধ্যরজনী। মোতির শয়নকক্ষে বাঁধভাঙা চাঁদের আলোর ঢল নেমেছে। আর তারই মাঝখানে শুভ্রবসনা মোতি মূর্তিমতী রাগিণীর মত দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ালে রাজপুত চিত্রকরের আঁকা পট। বেদীতে তানপুরা। কুলুঙ্গীতে ঘুঙুর।

মাটিতে আজ আকাশের চাঁদ গলে গলে পড়ছে। পৃথিবী মায়াময়। ধীর পদক্ষেপে ঝরোকায় এসে দাঁড়াল মোতি।

দূরে কোন এক পান্থ মিঠে গলায় গান গাইছে, নিদ নহি আবত সৈঁয়া—আঁখিপাতে ঘুম নেই।

মোতির চোখেও আজ ঘুম আসছে না।

ঘুম নেই শুধু ক্লান্তি। পুষ্পবল্লরীর মত নিজেকে বিছিয়ে দিল মোতি মাটিতে। উপুড় হ'য়ে শুয়ে কাত ফিরে চাঁদের দিকে চেয়ে রইল অনিমিখ।

নাচনেওয়ালী সে। তবু তার যৌবন আজও সদ্য ফোটা ফুলের অনাঘ্রাত। যে গুল-বাগিচায় কোন বুলবুল এসে বসেনি, তারই মতো একান্তে প্রতীক্ষা করে বসে আছে মোতি।

মনে পড়ল মোতির সেই নওজোয়ান অশ্বারোহীর মুখ। সকালে ও সন্ধ্যায়, দু' দুবার দেখেছে তাকে। ঘুরে ফিরে তার কথাই মনে পড়তে লাগল মোতির বার বার। কে সে? কোথায় ঘর? কেন সে অমন করে তাকাল? নাচের জলসায় আদব ভুলে গিয়ে কেন সে আজ রাজার সামনেই তাকে তারিফ ক'রে বাহবা দিয়ে উঠল?

মোতির মনে আজ শুধু তার কথাই জেগে আছে। জেগে আছে আর থেকে থেকে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে। আর সেই ঝঙ্কারে আজ মোতি অপরূপ রাগরাগিণী শুনতে পাচ্ছে।

মাটির বুকে নিঃশ্বাস ফেলে মোতি অস্ফুটে ব'লে ফেলে,—নজরৌঁসে নজর মিলিতো দিল হি বাওরী—

কথাটা বলে নিজেই নিজেকে ভৎর্সনা করে মোতি। এমন নিলাজ হ'য়ে কার কথা ভাবছে সে? 'শায়ের' পাঠাচ্ছে কার উদ্দেশে?

ঘুম এল মোতির চোখে অনেক রাতে। আর তার অকলঙ্ক সুন্দর মুখ চেয়ে জেগে রইল চাঁদ।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

সমাজবাদী পরিকল্পনায় ব্যক্তিস্বাধীনতা

আবু সয়ীদ আইয়ুব

সুচিন্তিত সুলিখিত আটটি প্রবন্ধের সমষ্টি।[১] প্রকর্ষিত চিত্তের ফল, শাঁসালো কিন্তু দুষ্পাক নয়। ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাতত্ত্ব—এই সব বিবিধ ক্ষেত্র থেকে আহরিত তাদের রস। কিন্তু রসের বাড়াবাড়ি নেই কোথাও, অন্য দিকে যেমন তত্ত্বকথার কচকচানি কিংবা বিদ্যা ফলানোর চেষ্টা একেবারে অনুপস্থিত। বাংলা প্রবন্ধের লঘুচিত্ত-চাপল্যে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা খুব সোয়াস্তি বোধ করবেন না এই বই পড়তে, আবার যাঁরা চিন্তারাজ্যে নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের আশা নিয়ে আসবেন তাঁরাও একটু হতাশ হবেন। এ প্রবন্ধসমষ্টির যে গুণটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে তাদের বিষয়বৈচিত্র্য, সেই সব বিচিত্র ক্ষেত্রে লেখকের স্বচ্ছন্দ বিহার, তাঁর প্রকাশ ভঙ্গীর স্বচ্ছতা। হুমায়ুন কবিরকে যাঁরা রাজনৈতিক নেতা কিংবা আমলাতন্ত্রের একজন পুরোধা বলে জানেন তাঁরা এ বই পড়ে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হবেন। বিস্মিত হবেন এই ভেবে যে তাঁর নিরেট কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি কোন্ কৌশলে চিৎপ্রকর্ষের এতখানি অবকাশ সৃষ্টি করলেন; আনন্দিত হবেন উপযুক্ত রোদবৃষ্টি না পেয়েও ফলন এত ভাল হয়েছে দেখে।

মলাটেই বলা হয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উপলব্ধি প্রবন্ধগুলিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। সেই সঙ্গে সামাজিক বিধানের প্রয়োজন বিষয়েও লেখক খুবই সচেতন। এবং উভয়ের মধ্যে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির মধ্যে দুর্নিবার সংঘাতটিও তাঁর চোখের সামনে সর্বদা উপস্থিত। প্রকাশকের ঘোষণা অনুযায়ী এই প্রসঙ্গ বা সমস্যার ছায়াপাত সমস্ত প্রবন্ধে থাকলেও যে-প্রবন্ধগুলির এটাই প্রধান আলোচ্য সেগুলির বক্তব্য বিষয়ে কবিরের সঙ্গে আমার মতের ঐক্য ও অনৈক্য নিয়েই এই পর্যালোচনা।

দেশ-কাল-পাত্র ভেদে গণতন্ত্র বিভিন্ন রূপ ধারণ করলেও তাদের মধ্যে একটি ঐক্য ধরা পড়ে। সেই ঐক্যের সন্ধান দিতে গিয়ে কবির বলেছেন :

"The one thing that distinguishes all the different political systems and ideologies which we call democratic is the urge to establish an equivalence if not identity between duties and rights." (p. 27)

আরো একটু বিশদ করে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যকে কবির দুটি সূত্রে বিশ্লিষ্ট করেছেন :

"(*a*) The attempt to establish the equality of rights and duties for all members of a community, (*b*) the attempt to make all rights and duties coincident."

প্রথম সূত্রটি সহজেই বোঝা যায়, কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই সেখানে। দ্বিতীয়টি আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয়, অথবা বলা ভাল যে তার যে-অর্থ পরিষ্কার সে অর্থে তাকে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলে আমি মানতে পারি না। দুটি পদার্থের মধ্যে 'সমীকরণ',

[১] Humayun Kabir—Science, Democracy and Islam and Other Essays, pp. 126. George Allen & Unwin. 12*s.* 6*d.*

'তাদাত্ম্য' বা 'সমপাত' সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দুটি পদার্থ একই, অন্তত একই পদার্থের দুই ভিন্ন রূপ। কিন্তু কবির নিশ্চয়ই বলতে চাননি যে একই ব্যাপারকে একাধারে কর্তব্য এবং অধিকার বলে গণ্য করা যেতে পারে, একদিক থেকে দেখতে গেলে যা আমাদের অধিকার, অন্যদিক থেকে তাই কর্তব্য। খুব সম্ভব তিনি যে-সম্পর্কের কথা ভাবছেন সেটাকে লাস্কির ভাষায় correlation বলা যায়—কবির নিজেও ঐ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে correlation- এর অর্থ হবে অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ—অধিকার-লাভের জন্যই কর্তব্যপালন, কর্তব্যপালনের জন্যই অধিকারলাভ। সমাজ যদি আমার কতকগুলো অধিকার স্বীকার করে তাহলে সমাজের প্রতি কতকগুলো কর্তব্য আমাকেও স্বীকার করে নিতে হবে। প্রাপ্য এবং দেয়র মধ্যে একটি সমতা থাকা সংগত বইকি। কিন্তু ঐ 'কর্তব্যপালনের জন্যই অধিকারলাভ' কথাটা নিয়ে একটু গোল বাধে, অথচ অনেক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ও সমাজসেবী ওটার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। গান্ধীজির কাছে তো সেটা ধর্মেরই সামিল ছিল; লাস্কিও বলছেন :

"My rights are built always upon the relation my function has to the well-being of society, and the claims I make must, clearly enough, be claims that are necessary to the proper performance of my function". (*Grammer of Politics*, p. 95).

সমাজের কাছ থেকে আমার সমস্ত অধিকারের দাবী শুধু এইজন্যই যে সমাজের হিত-সাধনে আমি আত্মনিয়োগ করব—একথা যদি বা সত্য হয়, গণতন্ত্রের বিশেষ ধর্ম তাকে বলা যায় না। ডিকটেটরী রাষ্ট্রেও অধিকার ও কর্তব্যের এই ধরণের সমীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়, বরঞ্চ আরও বেশী দেওয়া হয়। ফ্যাশিস্ট ও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রেই ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ এবং অঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ব্যক্তির স্বকীয়তাবিকাশের এবং স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য কোনো বিশেষ অধিকার সমষ্টিবাদী সমাজ গ্রাহ্য করে না। কর্তব্যের জন্য অধিকার—এটা সমষ্টিবাদেরই মূলমন্ত্র হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির জীবনের সব ধারাই সমাজের খাতে প্রবাহিত হবে এমন কোনো কথা নেই। শুধু জৈবিক সুখসম্ভোগের কথা আমি বলছি না; আমার জীবনের যা শ্রেষ্ঠ ফসল তাও সমাজের নৈবেদ্য সাজাবার জন্য নয়, অন্তত সবটা নয়। আমি যেখানে শিল্পী বা জ্ঞানী, ভগবানের বা মুক্তির সন্ধানী, সেখানে আমার সাধনার মূল উৎস সমাজ-হিতৈষণা নয়—যদিও আমার সাধনা সফল হলে সমাজের তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। আমি কিছু হতে চাই বা পেতে চাই—এই সব অধ্যাত্মকর্মের মূল প্রেরণা তাই, অন্যকে কিছু দেবার তাগিদ সেখানে গৌণ, অবচেতন। হার্টম্যান এ ধরণের চারিত্র্যগুণের নাম দিয়েছেন 'radiant virtue'। এমন সব গুণী বা সাধকের কাছ থেকে অন্যেরা আলো পেতে পারে যেমন করে প্রদীপ থেকে লোকে আলো পায়। গ্রহীতা আছে একপক্ষে কিন্তু অন্যপক্ষে কোনো দাতা নেই, আপন তেজে পুড়েই সে আলো দিয়েছে, দান না করেই সে ধন্য করেছে। অনেক আগে র‍্যাড্‌লীও চরিত্রের এইসব ব্যক্তিক বা আত্মস্থ সদ্‌গুণের সঙ্গে সামাজিক বা পরার্থী সদ্‌গুণের পার্থক্য নির্দেশ করে গিয়েছিলেন, এবং সেই সূত্রে একটি স্মরণীয় বাক্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন :

"Man is not man at all unless social, but man is not much above the beasts unless more than social." (*Ethical Studies*, p. 223)

বলাবাহুল্য যে মরুভূমি বা তুষারপর্বতে যদি বা কোনো মানুষ একাকী বাঁচতে পারে,

সেখানে একা বসে সে জ্ঞানান্বেষণ কিম্বা শিল্পচর্চার কোনো প্রেরণা অনুভব করবে না—করলেও নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু আবশ্যক তার গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবে না সে প্রেরণা। বহুলোকের, বহুবংশের যৌথ ও পরস্পরসাপেক্ষ চেষ্টার প্রয়োজন এই সবের বৈদগ্ধ্য-সাধনের জন্য। কিন্তু সমাজনির্ভর হলেও জ্ঞানী ও শিল্পীর সাধনা মূলতঃ সমাজমুখিন্ নয়। অথচ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের এই সমস্ত একান্ত ব্যক্তিক ক্ষেত্রেও সমাজের কাছ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সুবিধা (রাজনীতির ভাষায় 'rights') দাবী করব বইকি। লাস্কি নিজেও স্বীকার করেছেন যে,

"rights are those conditions of human life without which no man can seek in general to be himself at his best."

এবং একথা সমষ্টিবাদী সমাজের বাইরে নিশ্চয়ই কেউ বলবে না যে সামাজিক মঙ্গল-সাধনই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে a man can seek to be himself at his best. প্রত্যুত্তরে অবশ্য এমন যুক্তি দেখানো সম্ভব যে সমাজ যখন বহু ব্যক্তির সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয় তখন আমি-আমার নিজের ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণতাসাধনে সমাজেরই হিতবিধান করছি। সুতরাং এক্ষেত্রেও সমাজের কাছ থেকে আমার অধিকারের দাবী সামাজিক কল্যাণার্থেই। যুক্তিটা এক হিসাবে ঠিক। তবু এটা মনে রাখা ভাল যে আমাদের কর্মপ্রেরণার একভাগের লক্ষ্য অন্যকে কিছু দেওয়া, অন্যভাগের লক্ষ্য নিজে কিছু হওয়া বা পাওয়া, এবং উভয় বিভাগে আমরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমাদের অধিকারের স্বীকৃতি দাবী করি। বরঞ্চ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিকারকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই সব রাষ্ট্রে নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই লাস্কির এই উক্তি সত্য যে liberty is a product of rights. একনায়কতন্ত্রেও কতকগুলি অধিকার স্বীকৃত হয়—যথা উপযুক্ত বেতনসহ কর্মের অধিকার, পঙ্গু হলে পেন্সনের অধিকার, সন্তানের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু এইসব অধিকারের উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অঙ্গরূপে পুষ্ট করা, রাষ্ট্রের সেবার জন্য প্রস্তুত করা; ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বকীয় যে-মর্যাদা তার যথোপযুক্ত স্বীকৃতি নেই সমষ্টিবাদী সমাজে।

কবির যথার্থই বলেছেন যে একটি বিশেষ শাসনব্যবস্থার নামই গণতন্ত্র নয়, যদিও সেই বিশেষ শাসনব্যবস্থা (অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনবিধি রচনা ও শাসনকার্য চালনা) না থাকলে গণতন্ত্রের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের অন্য আবশ্যিক শর্তরূপে কবির নির্দেশ করেছেন মোট সামাজিক আয়ের সমান বণ্টন, অন্তত বণ্টন-ব্যবস্থায় বিরাট কোনো অসাম্য না থাকা। এই ধনসাম্য যদি স্থাপন করা হয় উৎপাদনোপকরণের উপর সমষ্টীকৃত আধিপত্য ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা তবে তা সমাজবাদ বলে অভিহিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো মনীষী মনে করেন যে গণতন্ত্র ও সমাজবাদের মধ্যে একটি মৌল বিরোধ রয়েছে, কবির তা মনে করেন না। আগেই বলেছি যে এটাই বর্তমান গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা করবার আগে আমি গণ-তন্ত্রের আরো দুটি মূল শর্ত বা ভিত্তির কথা বলতে চাই—যার গুরুত্ব পূর্বোক্ত দুটি শর্তের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়।

কেবলমাত্র শাসনবিধি ও অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় গণতন্ত্র। তার ভিত্তি আরো গভীরে। মানুষের মনের একটি বিশেষ মেজাজ বা দৃষ্টিভঙ্গীর এবং একটি বিশেষ আদর্শের প্রতি আনুগত্য ব্যতীত গণতন্ত্রের পূর্ণ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সে মেজাজের গোড়ার

কথা হোল tolerance— বাংলায় যাকে পরমত-সহিষ্ণুতা বলা হয়। কিন্তু টলারেন্সের অর্থ কেবল পরের মত সহ্য করা নয়। নিজের বা নিজের দলের মত ও পথ আমার বা আমাদের কাছে আপাতত যত সত্য বলেই প্রতিভাত হোক, তাকে অমোঘ কি অকাট্য জ্ঞান না করা, এবং অন্যের বা অন্যদলের মত ও পথ আপাতত যতই মিথ্যা অথবা অসৎ মনে হোক তাকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখা, হয়ত তাই একদিন সত্য এবং সৎ বলে নিজেকে সপ্রমাণিত করতে পারে এমন একটি সন্দেহভাবকে মনের কোণে স্থান দেওয়া—এ সবই টলারেন্স শব্দার্থের অন্তর্ভুক্ত। গণতন্ত্র কার্যক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ও রুচি অনুযায়ী চলার নীতি স্বীকার করে; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভের ফলেই কোনো মত সত্য এবং কোনো রুচি বরেণ্য বলে প্রতিপন্ন হয়ে যায় না। কাজেই সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকেও প্রমাণ করবার বা বিপরীত পক্ষকে দিয়ে মানিয়ে নেবার সর্বদাই সুযোগ দিতে হবে যে তাদের মতই সত্য এবং তাদের আদর্শই শ্রেয়। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, অন্যদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠের সম্মান—এই যুগল স্তম্ভের উপর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

স্বমতের যাথার্থ্য ও পরমতের ভ্রান্তি সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দেহভাব যেমন গণতন্ত্রের প্রতিকূল, তেমনি সব সত্যকেই আপেক্ষিক ও সব আদর্শকেই ক্ষণিক জ্ঞান করা-রূপ সর্বগ্রাসী সন্দেহবাদও গণতন্ত্রের বিনাশের কারণ হতে পারে। ভৌগলিক মরুভূমিতে যেমন মানুষের শরীর বাঁচে না, আধ্যাত্মিক মরুভূমিতে তেমনি মানুষের চিত্ত নিতান্ত অসহায় ও দিশেহারা বোধ করে। মনের মাটিতে কোনো ধ্রুব আশ্রয় যদি কোথাও না থাকে তাহলে যে মানুষ অধ্রুবতার মধ্যেই স্থির থাকতে পারে এমন নয়, সে তখন ব্যাকুল হয়ে যে-কোনো প্রকারের আপ্তবাক্যকেই আঁকড়ে ধরতে ছোটে—যদি সে বাক্যের পেছনে গলার, সংখ্যার বা রাজশক্তির জোর থাকে। তা ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রের সুদূরপ্রসারী সর্বভুক শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে কোনো নাগরিক যখন নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হয় তখন সে কেবল তার ছোটখাট সুখদুঃখ বা বৈষয়িক লাভক্ষতির কথাই ভাবে না। জীবনে সে যে সত্যকে ধ্রুব বলে গ্রহণ করেছে, যে আদর্শকে মহান বলে বরণ করেছে, তার প্রতিই যখন আঘাত আসে—সে আঘাত কোনো সর্বাধিনায়কের হাত থেকেই আসুক আর সংখ্যাগুরু কোনো দলের হাত থেকেই আসুক—তখনই তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার প্রকৃত শক্তি সে খুঁজে পায় নিজের মধ্যে। যদি আপন মতের প্রতি কোনো আস্থাই কোথাও না থাকে, অর্থাৎ সেটাকে যথার্থ সত্য বলে বিশ্বাস না করে হাজারটা মতের একটা মত মাত্র ভাবি, তবে তার জন্য প্রাণ কেন কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত দিতে কেউ এগিয়ে আসবে না। এমন অবস্থায় যদি কোনো দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজপুরুষ বা রাজনৈতিক দল সত্যাসত্য ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি চূড়ান্ত-ভাবে নির্ধারণ করে দেওয়ার দাবী জানায় তবে সে দাবী প্রতিরোধ করবার শক্তি এবং প্রেরণা ক'জনের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে?* নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ী-নিরপেক্ষ সত্যে বিশ্বাস রাখা অথচ পরমতকে সর্বদা অবিচলিত ঔদার্যে ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে বিচার করা, ভ্রান্ত জেনেও তাকে অবজ্ঞা না করা—একই চিত্তে এই দুই আপাতবিরোধী মনোভাবের সহভাবিত্ব অত্যন্ত দুঃসাধ্য সে কথা মানতেই হবে। পনেরো আনা লোক হয় কোনো সার্বজনীন সত্য বা শ্রেয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, জনে জনে সত্যের ও শ্রেয়ের প্রতিমানকে ভিন্ন জ্ঞান করে, নতুবা নিজের মত ও আদর্শকে চূড়ান্ত সত্য জেনে অন্যের মতবিশ্বাসের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। অথচ

* এই প্রসঙ্গের বহুতথ্য-সংবলিত আলোচনা পাওয়া যাবে Polanyi-র *The Logic of Liberty* নামক গ্রন্থে।

কোনো একটি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সত্য আছে একথা মানার সঙ্গে সঙ্গে এটা মোটেই অবধারিত হয়ে যায় যায় না যে আমিই সে সত্যে পৌঁছে গেছি, অন্য মতাবলম্বীরা সবাই ভ্রান্তির তিমিরে মগ্ন। নিরপেক্ষ সত্যের যেমন চরম মূল্য স্বীকার্য, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের মতন করে নিজের সাধ্য অনুযায়ী সে সত্যান্বেষণের স্বাধীনতার মূল্যও তেমনই চরম, কোনো অবস্থাতেই তার ব্যত্যয় বা লাঘব ঘটতে দেওয়ার মত সর্বনাশা বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়।

কাজেই গণতন্ত্রের দুটি বাহ্য শর্ত রাষ্ট্রক্ষমতার এবং সামাজিক উৎপাদনের সমবণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি মানসিক ভিত্তি পরমসহিষ্ণুতা এবং জাগ্রত সত্য ও শ্রেয়বোধকেও আমি সমান প্রাধান্য দিই। তার মানে এই নয় যে বাস্তবিকক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রগুলিকে আমরা গণতান্ত্রিক বলে জানি তাতে উল্লিখিত সবকটি শর্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, বা কোনো শর্তই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। গণতান্ত্রিকতার দাবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বোধ করি সবচেয়ে সোচ্চার এবং আত্মপ্রসন্ন। গণতন্ত্রের পূর্বোক্ত শর্তগুলির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় শর্ত সেখানে ক্ষীণ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ শর্ত প্রায় অনুপস্থিত। গণতন্ত্র আদর্শগতভাবে কি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তার চেহারা কি রকম এদুটো প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট হলেও এক নয়। কবিরের সঙ্গে আমি একমত যে,

"In addition to the natural fluidity of content in any concept, we have here an additional element of uncertainty in the natural human tendency to confuse ideals with actual conditions." (p. 26)

বলাবাহুল্য উপরে আমরা গণতান্ত্রিক আদর্শেরই বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি, গণতান্ত্রিক বাস্তবের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়নি।

এইবার গণতন্ত্রের প্রথম দুটি শর্তের অন্বয় বা অন্বয়াভাবের সমস্যায় ফিরে আসা যাক। কোনো সন্দেহ নেই যে বংশমর্যাদার অসাম্য যেমন অধিকাংশের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছিল মধ্যযুগে, তেমনি আজ অর্থনৈতিক সুযোগের অসমতা অধিকাংশের দেহমনের বিকাশকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এই দিক থেকে বিচার করলে স্বাধীনতা যে সাম্যের উপর নির্ভরশীল সেটা বুঝতে খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার করে না। আর্থিক সাম্য যদি দেবতার বরস্বরূপ পাওয়া যেত এবং কোনো মন্ত্রবলে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হোত তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু মুস্কিল এই যে স্বাধীন সমাজে ধনবণ্টনের সমতা যদি বা স্থাপিত করা হয়, সেটা দুদিনেই লুপ্ত হয়ে যায় কারণ যারা প্রকৃতির একচোখোমির ফলে অসমান অর্থাৎ অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও স্থূল-বিবেক তারা মাঝারি মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের তহবিলে সামাজিক ধনোৎপাদনের মোটা অংশ তুলে নিতে বিলম্ব করবে না। কাজেই ধনসাম্যকে স্থায়ী রূপ দিতে হলে আর্থিক জীবনযাত্রাকে নানাবিধ নিয়মে বাঁধতে হয়, স্বেচ্ছাচারী প্রতিযোগ নীতির স্থলে কেন্দ্রীয় পরিচালনার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এবং তখনই ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে বলে রব ওঠে। সে রব শুধু ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থশিবিরের রণদামামা থেকেই ওঠে না। কবির যখন বলেন : "Liberty and security may be regarded as the systole and diastoleof the human mind" তখন একটি বিমূর্ত তত্ত্ব হিসাবে সেকথা মেনে নিতে বাধা নেই। কিন্তু প্রয়োগকালে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়, কবিরের সুন্দর উপমাটিতে তার নিরসন খোঁজা বৃথা।

একটি বিরাট রাষ্ট্রে গোড়া ঘেঁষে সমাজবাদ পত্তন করবার পূর্ণোদ্যম চেষ্টা চলেছে গত চল্লিশ বছর ধরে, অনেক পরিমাণে সে চেষ্টার সফলতা আজ অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে এও

দেখা গেছে যে উক্ত রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং rule of law নামক আধুনিক পাশ্চাত্য ইতিহাসের বহুযত্নলালিত ছোট চারাগাছটিকে মূচড়ে ফেলা হয়েছিল, আমলাতান্ত্রিক ব্যভিচারে কিংবা অধুনা যার নাম দেওয়া হয়েছে cult of personality তারই তাণ্ডবলীলায় শিল্পসাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞান অধ্যাত্মবিকাশের যাবতীয় ক্ষেত্র নিষ্ঠুর ভাবে পদদলিত হয়েছিল। ছমাস আগে পর্যন্ত এ নিয়ে তিক্ত বাদানুবাদ চলত, আজ তার ভয়াবহ ইতিবৃত্ত স্বয়ং ক্রুশ্চেভের মুখে উদ্ঘাটিত হোল। সমাজবাদের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই প্রত্যাহার কেমন করে সম্ভব হোল আজ সে প্রশ্ন সমাজবাদের শত্রুমিত্র সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। এ কি কেবল স্তালিনের ক্ষমতামদমত্ত স্বেচ্ছাচারের ফল; নানা ঐতিহাসিক কারণে সোভিয়েট সাম্যবাদ যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল তারই দুষ্ট প্রত্যঙ্গ; চারিদিককার সাম্রাজিক শক্তিগুলির হিংস্র আক্রমণের পৌণঃপুনিক চেষ্টা এবং আভ্যন্তরীন বিপ্লব ঘটাবার অবিরাম ষড়যন্ত্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া; নাকি সমাজবাদের অন্তরেই এসবের বীজ নিহিত ছিল?

আগেই বলা হয়েছে যে সমাজবাদ বলতে কেবল ন্যায়নীতির সামাজিক প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্যের উচ্ছেদ, ধনের সমবণ্টন প্রভৃতি কয়েকটি উচ্চ আদর্শই বোঝায় না, সেই সব আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়ার একটি বিশেষ পদ্ধতিও সমাজবাদের অভিধাভুক্ত। সে পদ্ধতির মূল কথা হোল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত অর্থনীতি। অবশ্য আজকের দিনে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা কেবল সমাজবাদের মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধনিকতন্ত্রও শত্রুর কাছে পাঠ নিয়েছে, laissez faire বা অবাধ অর্থনীতি পরিত্যাগ করেছে, সরকারী নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ধনতন্ত্রের বুদ্ধিজীবি অধিবক্তারা (উদারপন্থী নামেই তাঁরা পরিচিত, অন্তত পরিচিত হতে ইচ্ছুক) বলেন, তাঁরা যে-নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী তার সঙ্গে সমাজবাদী নিয়ন্ত্রণের প্রভেদ শুধু মাত্রাগত নয়, গুণ-গত। ক্লাসিকাল অর্থবিজ্ঞানীরা তাঁদের বিজ্ঞানের যে সব নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি একটি আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার নিয়ম, কোনো বাস্তব সমাজে তা সম্পূর্ণ খাটে না। খাটে না কেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁরা কয়েকটি বিঘ্নবিপত্তির (frictions and disturbances এর) কথা বলেছিলেন। উদারপন্থীদের মতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই বিঘ্নগুলি দূর করে এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রণয়ন করা যেটা তাঁদের বিজ্ঞান-সম্মত, যেখানে ক্লাসিকাল ইকনমিক্সের নিয়মগুলি অবিকৃত ও অব্যাহতরূপে প্রযোজ্য। আরও একটু বিশদ করে বলা যায় যে উদারপন্থী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনিকপক্ষে সর্বগ্রাসী একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে তোলাতে বাধা দেওয়া এবং শ্রমিকপক্ষে যাতে কেউ প্রাণের দায়ে কোনো চুক্তি বা শর্ত মানতে বাধ্য না হয় তার ব্যবস্থা করা (prevention of necessitious bargaining)। এর সঙ্গে সমাজবাদী নিয়ন্ত্রণের পার্থক্য সুস্পষ্ট। লিপ্‌ম্যানের ভাষায় দুই নীতির মূল প্রভেদ হচ্ছে :

"In the liberal philosophy the ideal regulator of the labour of mankind is the perfect market; in the collectivist philosophy it is the perfect plan imposed by the omnipotent sovereign." (Lippmann.—*The Good Society*, p. 236)

কিন্তু ক্রমশই প্রমাণিত হচ্ছে যে উদারপন্থীরা এই পার্থক্যকে যত দুর্লঙ্ঘ্য জ্ঞান করেছিলেন কার্যক্ষেত্রে তা তত দুর্লঙ্ঘ্য নয়। সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রনেতারা এত দিনকার

অভিজ্ঞতায় হৃদয়ঙ্গম করতে বাধ্য হয়েছেন যে অর্থনীতি থেকে মার্কেটের প্রভাব নাকচ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। বাজারের সঙ্গে উৎপাদন ও বণ্টনের সম্পর্ককে সর্বদা চোখের সামনে না রাখলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অরাজকতা ঘটে। অপরপক্ষে উদারপন্থী রাষ্ট্রগুরুরা বুঝতে পারছেন যে একবার নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার প্রয়োজন স্বীকার করলে তার পরিধি ও গভীরতা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলতে হয়, কোথাও থামতে চাইলেই ঠিক সেইখানটায় থামা যায় না, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তার পরের পদক্ষেপকে অনিবার্য করে তোলে। বিপদ সেইখানে।

এই বিপদের মধ্যে অভয়বাণী শোনা যায়-যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে কেবল অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলিকে আনলেই চলবে, জীবনের অবশিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবার কোনো প্রয়োজন ঘটবে না। অর্থাৎ সমাজজীবনের স্থূলবিভাগে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে রাজী থাকি তাহলে ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্ম ও সুকুমার বিভাগ-গুলিতে আমাদের স্বাধীনতা আরো পরিপূর্ণ এবং নিরঙ্কুশ হবে। কিন্তু আর্থিক ও পারমার্থিক স্তরগুলিকে এমন একান্ত পৃথক জ্ঞান করা ভুল। মার্ক্সের ভাষায় একটাকে সামাজিক ইমারতের ভিৎ এবং অপরটাকে তার চূড়া বল্লে খুব লাগসই উপমা দেওয়া হয় না যদিও, তবু এটা তো অবিসংবাদিত যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সংস্কৃতির সূক্ষ্মতম বিকাশও উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদন-উপকরণের যথোপযুক্ত প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। এবং মোট উৎপন্ন ধনের কত ভগ্নাংশ সামাজিক ব্যয়ের কোন খাতে প্রবাহিত হবে, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে তার চরম নির্ধারক হবেন কোনো এক শাসন-পরিষদই। ভাববার কথা এই যে সমগ্র অর্থনীতির উপর যাদের অধিকার নির্ব্যূঢ় হবে সামাজিক সংস্কৃতির চাবিকাঠিও তাদের হাতেই গিয়ে পড়বে, কারণ

"economic control is not merely control of a sector of human life which can be separated from the rest, it is the control of the means of all our ends." (Hayek—*Road to Serfdom*, p. 68).

অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অনুষঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা অনিবার্য না হলেও দুর্নিবার হয়ে ওঠে, উৎপাদনশক্তির সমষ্টীকরণ চুম্বকের মত টেনে আনে চিন্তাশক্তির সমষ্টী-করণকে। অত্যন্ত সুব্যবস্থিত পরিকল্পনা-চালিত সমাজে মৌলিক মতবিরোধ বা দ্রুত মত-পরিবর্তনের অবকাশ নেই। এবং দেশব্যাপী ও দূরদর্শী কোনো পরিকল্পনা গৃহীত হলে তাকে কাজে পরিণত করবার জন্য যত গভীর ও ব্যাপক ঐকমত্যের প্রয়োজন, দেশের অধিকাংশ লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অতখানি একমত হতে পারবেন এ আশা দুরাশা। ফল হবে এই যে কতিপয় বুদ্ধিমান প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যখন এই প্রয়োজনীয় ঐকমত্যে পেঁছবেন তখন তাঁদের সেই মত অধিকাংশকে মেনে নিতে বাধ্য করা হবে বলে বা কৌশলে। তাছাড়া আমাদের সকলের জীবিকার একমাত্র নির্ভর হবে সরকারী নিয়োগপত্র, কাজেই আমলাতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ, রুচি ও খেয়ালের প্রতি আনুগত্য ছাড়া কারুর উপায় থাকবে না। এখন তো তবু একজন বা একদল কর্তার বিরাগভাজন হলে অন্য কর্তার অধীনে কর্ম পাওয়ার আশা আছে, তখন জনগণের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা হবেন সরকার। ত্রত্স্কীর সাবধানবাণী আমরা স্মরণ করতে পারি :

"In a country where the sole employer is the State, opposition means death by slow starvation. The old principle—who does not work shall not eat has been replaced by a new one: who does not

obey shall not eat."

ইত্যাকার অধুনা-প্রদর্শিত অনেকগুলি যুক্তির বিভীষিকার সম্মুখে কবিরের ভরসা যে "planning need not necessarily be imposed from above' একটু দুর্বল শোনায় বইকি। কবির বলতে চান,

"Just as the political decisions of a democracy are the inter play of the inclinations, wills and decisions of a multiplicity of individuals, the planning of Welfare State can be the result of the wishes, desires and hopes of all its citizens." (p. 56)

উদ্ধৃত বাক্যের উপমানটিও পূর্ণ বাস্তবরূপে দেখা দেয়নি কোথাও, উপমেয়র অস্তিত্ব তো একেবারেই কল্পরাজ্যে। কিন্তু যতই দূরবর্তী এবং দুরূহ হোক কোনোটাই অসম্ভব নয়। তবে সম্ভব করতে হলে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ উভয় বিষয়ে এবং উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে আরো অনেক ভাবতে হবে, জানতে হবে। ডিকটেটরী রাষ্ট্রে পুরোদস্তুর প্ল্যানিং-এর বাস্তব চেহারা ইতিমধ্যেই একাধিক ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে, তার দোষগুণ দুই-ই আজ আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত। গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিকল্পিত অর্থনীতির পূর্ণ পরীক্ষা এ পর্যন্ত কোথাও হয়নি; ব্রিটেনে, সুইডেনে, নিউজিল্যাণ্ডে যেটুকু চেষ্টা চলেছিল তা জনমতেই অনেকটা স্থগিত, কতকটা প্রত্যাহৃত। ভারতবর্ষে সম্প্রতি খুব ঘটা করে সমাজবাদী অর্থনীতির সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু সূত্রপাতই। সেপথে এগুতে হলে যোজনা-সংসদের উচ্চাভিলাষকে আরো খাটো করে নিতে হবে, নাকি ভারতীয় গণতন্ত্রের কচি চারাগাছটি মাড়িয়ে এগুব আমরা—তার উত্তর ভবিষ্যতই দিতে পারে। এই যাত্রারম্ভের শুভমুহূর্তে যাঁরা কবিরের মত (আমিও নিজেকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করি) গণতান্ত্রিক রজানীতি ও পরিকল্পিত অর্থনীতির সাযুজ্যে বিশ্বাসী অথচ তার পর্বতপ্রমাণ দুরূহতা সম্বন্ধে সচেতন, তাঁদের বিশেষরূপে বুঝে দেখা দরকার গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার আদর্শ ও পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কী, ডিকেটটরী পরিকল্পনা থেকে তার জাতরক্ষা কেমন করে কোন্ পথে সম্ভব হতে পারে।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে দুইপ্রকার পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা সহজ, যদিও সে পার্থক্যের কথা সর্বদা চোখের সামনে রাখা সহজ নয়। সহজ না হলেও অত্যাবশ্যক। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই পরোৎকর্ষ-সাধন; ধনোৎপাদন ও বণ্টনের সমষ্টীকরণ, শিল্প ও কৃষিকর্মের প্রভূত উন্নতি, সার্বিক প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা—সমস্তই তার উপায় মাত্র। অন্য পক্ষে, এ যাবৎ যে দুটি প্রধান সর্বাধিনায়কী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পরিচয় আমরা পেয়েছি তার মধ্যে ফ্যাশিস্ট প্ল্যানিং-এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ একটি জাতিকে পৃথিবীর সর্বোত্তম ও সর্ববিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিপন্ন করা, এবং কম্যুনিস্ট প্ল্যানিং-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পণ্যোৎপাদনের অভাবনীয় প্রসার, প্রাকৃত শক্তিকে জয় করে মানুষের ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রয়োজন মেটাবার কাজে লাগানো। মার্ক্সীয় দর্শনের একজন আধুনিক অধিবক্তার ভাষায়,

"The ever-increasing development of all the productive forces and the resultant improved living standards for all people are at one and the same time the index of social evolution and the rational goal of mankind." (Howard Selsman—*Socialism and Ethics*, p. 112).

কবির এই প্রশ্নটি তুলেও এড়িয়ে গেছেন। বরঞ্চ তাঁর বিবেচনায়

"it would not be proper for the State to raise these questions

(about the increase in the happiness, peace and contentment of the individual), its business is to provide the material conditions which make good life possible." (p. 53)

রাষ্ট্রের 'business' সুষ্ঠু জীবনের জড় উপাদান মজুদ করাই হতে পারে, কিন্তু তার যাবতীয় কর্মের এই লক্ষ্যটি তার চরম লক্ষ্য না উপলক্ষ্যমাত্র এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার স্বরূপ গণতান্ত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করে নায়কতান্ত্রিক লক্ষণাক্রান্ত হতে পারে। শুধু পূর্ণ ও মুক্ত জীবনের অর্থনৈতিক উপকরণ পর্যাপ্ত বা প্রচুর করে দিলেই চলবে না (অবশ্য তা না করলেও চলবে না); তেমন জীবনের পথে রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক কিংবা শিক্ষাপদ্ধতিগত বিঘ্ন কোনো দিক থেকে আসছে কি না তার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের চরম উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতাই। এই planning for freedom-এর গণতান্ত্রিক আদর্শকে তুলনা করা যেতে পারে বামপন্থী সর্বাধিনায়কী সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য planning for plenty-র সঙ্গে। ঐ দুই প্রকার প্ল্যানিং পরস্পরনির্ভরশীল হলেও এক নয়। স্বাধীনতার ভরসা অবশ্য দারিদ্র্যসমস্যার সমাধান উটপাখীর কায়দায়ই করতে চেয়েছেন বরাবর; এবং নায়কতন্ত্রবাদিরা মাত্র ছমাস আগে প্রথম আবিষ্কার করলেন যে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য ঘটাতে গেলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বৃদ্ধিরও প্রয়োজন আছে। মার্ক্স্ যদিও সাম্যবাদের চরম উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিলেন :

"That development of human powers which is its own end, the true realm of freedom, which, however, can flourish only upon that realm of necessity as its basis"

কিন্তু এই আন্দোলনের পরবর্তী নেতা ও ভাবুকেরা উদ্দেশ্য এবং উপায়ের মধ্যে একটি মর্মান্তিক গোলযোগ বাধিয়ে বসলেন। কারও অবিদিত নেই যে সাম্যবাদী পরিকল্পনায় শিল্পসাহিত্য দর্শনবিজ্ঞান অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরূপে গণ্য হয়ে থাকে, ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্তত এ যাবৎ তাই হয়ে এসেছে।

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে কবির তার সঙ্গে সকলের, অন্তত অধিকাংশের, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জড়িত করবার কথা বলেছেন। যে-কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের ইচ্ছা ও রুচি স্বভাবতই এত বিচিত্র, বিভিন্ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী যে সে সমস্তকেই অক্ষুণ্ণ রেখে কোনো একটি সুষ্ঠু প্রয়োগসম্বদ্ধ পরিকল্পনায় স্থান দেওয়া যায় না। অথচ মোটামুটি ভাবে, সম্পূর্ণ না হোক প্রায়িক, মতসম্মতি প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজবাদী পরিকল্পনা কল্পলোকেই বাস করবে। সমস্যাটি অবশ্য গণতন্ত্রেরই সমস্যা। নায়কতন্ত্র তার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছে শাশ্বত ক্ষাত্রধর্মের মধ্যে। তবে তাদের নির্ভর যে কেবল বিধানকর্তার স্থূল সামরিক প্রতাপের উপর এমন নয়। আধুনিক বিজ্ঞান যেসব নূতনতর সূক্ষ্মতর বৈসামরিক অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিয়েছে সেগুলির ব্যবহারেও তারা সিদ্ধহস্ত। পাঠশালা থেকে উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের চিত্ত এমন মনোবৈজ্ঞানিক কৌশলে condition করা হয়-যে কোনো বিষয়ে কর্তৃবাক্য উচ্চরণ করতে শুধু যে তাদের সাহসের অভাব ঘটে তা নয়, স্বেচ্ছাচরণের প্রবৃত্তিই তাদের মনে বিনষ্ট হয়ে যায়, বাধ্যতার অভ্যাসকে স্বভাবের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, হুকুম এবং তামিলের মধ্যবর্তী মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বিলুপ্ত হয়ে অবশিষ্ট থাকে কেবল একটি স্নায়বিক ঘাত, একটি বৈদ্যুৎ-রাসায়নিক তরঙ্গ। তা না হলে দুই দশক জুড়ে স্তালিনী ব্যক্তিচর্চার দানবিক পর্ব এমন

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারত না।

পক্ষান্তরে, গণতান্ত্রিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করে মতসাম্যে পৌঁছবার সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি এখনও অনাবিষ্কৃত এবং গবেষণাধীন। সুখের বিষয় যে এই গবেষণার গুরুত্ব গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মনীষিরা ইদানীং উপলব্ধি করেছেন।* তাঁদের আশু সাফল্যের উপর গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। যদি কোনো পথ তাঁরা দেখাতে না পারেন তবে নায়কতন্ত্রের কাছে গণতন্ত্রের আত্মসমর্পণ অথবা আত্মস্বরূপ-সমর্পণ অবশ্যম্ভাবী।

উনিশ শতাব্দীর উদারপন্থীদের ধারণা ছিল যে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতির আদর্শরূপ হচ্ছে তাই যাতে ব্যক্তির উপর বাইরে থেকে কোনো চাপ পড়ে না, যাতে সমস্ত সামাজিক প্রভাব এড়িয়ে সে নিজের অন্তরের গভীরেই খুঁজে পাবে তার পূর্ণতার আদর্শ এবং সে পূর্ণতা-বিকাশের স্বকীয় রীতিনীতি। কিন্তু এ একেবারে অসম্ভব। সমাজের প্রভাব ব্যক্তির উপর পড়েই, শুধু তাই নয়, সে প্রভাবের মধ্যেই তার ব্যক্তিস্বরূপ ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে। মানুষের মন তো আকাশ থেকে নেবে আসে না, আপন পরিণত রূপ নিয়ে মায়ের পেট থেকেও জন্মায় না। পরিবারের, শিক্ষকমণ্ডলীর, বন্ধুবান্ধবদের, সহকর্মীদের, বৃহত্তর সমাজের এবং পূর্বপুরুষাগত ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় আদান-প্রদানের ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে ব্যক্তিচরিত্রের রূপ ও রেখা ফুটে ওঠে—যদিও তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বরূপটি অনন্য, সমাজের ছাপমাত্র বা সামাজিক প্রবাহের বুদ্বুদমাত্র নয়। সামাজিক প্রভাবকে কতক পরিমাণে কাটিয়ে উঠবার, কতকাংশে বর্জন করবার শক্তিও ব্যক্তির আছে। কিন্তু সমাজের প্রভাব থেকে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করা বা রাখার প্রস্তাবকে কবিকল্পনা বলবার মানে এই নয় যে সর্বাধিনায়কী রাজনীতির উল্টো চেষ্টাকে আমরা সমর্থন করব, চাইব একটি পূর্বকল্পিত ছকে ফেলে প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত স্বরূপটি গড়ে তুলতে। এটা সম্ভব হলেও ভয়াবহ। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার কাম্য হচ্ছে একটি মধ্যপন্থার সন্ধান, যাতে ব্যক্তি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধীনও নয়, সম্পূর্ণ অতীতও নয়। তাদের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বিভিন্ন ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে সৌসামঞ্জস্য স্থাপন করার চেষ্টা, এবং তাদের স্বাতন্ত্র্যকে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ বলে ধিক্কৃত ও বিলুপ্ত করে সবাইকে এক ছাঁচে ঢালাই করার সঙ্কল্পের মধ্যে প্রভেদ অপরিমেয়।

মানুষ অভ্যাসের দাস, শৈশবকাল থেকে যেসব শিক্ষা-দীক্ষা উপদেশ-অনুশাসন সে পেয়ে আসছে তার আচার-ব্যবহার অনেকটা সেসবের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যতাভিমানী মানুষের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া খুব সহজ নয়। স্বকীয় আদর্শে, স্বকীয় রুচি অনুসারে সম্পূর্ণ নিজের মত করে আচরণ করতেও শিখতে হয়, শিক্ষাচালিত না হওয়ার জন্যেও এক-রকমের উল্টোশিক্ষার প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সমাজ এই দুই প্রকার শিক্ষাকেই মূল্যবান জ্ঞান করে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে ঠিক নিজের মত হতে শেখায়, পাঁচজনের মত হতেও শেখায়; তার ব্যক্তিস্বরূপের স্বতস্ফূর্ত বিকাশের পথেও তাকে এগিয়ে দেয়, আবার তার ব্যক্তিসত্তায় সমাজস্বরূপকে আত্তীকৃত করতেও সহায়তা করে। ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততা ততক্ষণই মূল্যবান যতক্ষণ সে অপর কোনো ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততাকে আঘাত না করে, এবং ব্যক্তির সমাজীকরণ—যাকে তার সভ্যতাও বলা যেতে পারে—ততক্ষণই শুভ যতক্ষণ সভ্যতার মুখোশ তার ব্যক্তি-স্বরূপকে কুণ্ঠিত বিকৃত বা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত না করে ফেলে।

* পাঁচ বছর পূর্বে প্রকাশিত Mannheim-এর *Freedom, Power and Democratic Planning*-কে এই গবেষণার একটি প্রধান স্তম্ভ মনে করা যেতে পারে।

চলাচল—অসিত সেন।

অমিট্ ভালবাসল লাবণ্যকে, কিন্তু বিয়ে করল কেটিকে। একদিকে রোমান্স, আরেকদিকে গার্হস্থ্যাশ্রম। ঘড়ার জলে রান্না চলবে, দাঁঘিতে সাঁতার দেবে মন। পরে কী হল সেকথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি। বললেই বিপদ। লাবণ্যকে ভালবাসা নিয়ে কেটির মন অনবরত খচখচ করবে, আর লাবণ্যকে না পাওয়ার ক্ষোভে অমিট্ শান্তি পাবে না। রোমান্সের দাঁঘি উত্তাপে বাষ্প হয়ে যাবে, গৃহস্থালীর ঘড়া যাবে ভেঙে। সাধুজনেরা বলে থাকেন কামই প্রেম, প্রেমই কাম; বিজ্ঞানীরা বলেন জৈব ও সামাজিক প্রয়োজনের মধ্যেই প্রেম বিধৃত। তাই "শেষের কবিতা"র শেষ এত অবাস্তব। যেখানে গোড়ায় গলদ সেখানে শেষেই তা সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পায়।

তবু "শেষের কবিতা" পড়তে পারি, এমন কি 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'-ও "শেষের কবিতা" পড়া হবে। যে পড়বে সে কিছু আনন্দ পাবে। বন্ধুদেব বসুর প্রতি রবীন্দ্রনাথের ঠাট্টা মনে করে যে আমোদ পেতে পারে তা ছাড়াও সাহিত্যিক আমোদ পাবে। সেটা হচ্ছে স্টাইলের আমোদ। রীতির রহস্যে যে আমোদ পাওয়া যায় সেটা গল্পের মোচড়ে নয়, কলমের আঁচড়ে। নিছক লেখার জোরে যা খুশী চালিয়ে দেওয়ার এক নিদর্শন "শেষের কবিতা"। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য লেখকের হাতে পড়লে "শেষের কবিতা" পড়ার উপযুক্ত হত কিনা সবিশেষ সন্দেহ। এ ব্যাপারে অযথা গুরুত্ব আরোপ না করেও বলা চলে যে বাজারে "শেষের কবিতা" নামে যে ছবিটি বেরিয়েছিল, গল্প না বদলালেও তা "শেষের কবিতা" হতে পারত না, কারণ তাতে স্টাইল ছিল না, ছিল কাঁচা হাতের হিজিবিজি।

শুধু স্টাইলের জোরে ছবি তৈরী করতে পারেন এমন প্রতিভাধারী পরিচালক আমাদের দেশে কেউ আছেন কিনা জানি না। সত্যজিৎ রায় যদি কখনো বাজে গল্প নিয়ে কসরৎ করেন তাহলে তার ফলাফলের প্রতীক্ষা করব।

এইজন্য 'চলাচল' দেখেও আমার একটি চিরাচরিত ধারণা বিসর্জন দিতে পারলাম না। সেটি হচ্ছে এই যে কেবল ছবি তৈরীর ছলাকলার দিক থেকে দেখলে গল্প কিছু নয়, গল্প বলাটাই সব। প্রথমে মনে হয়েছিল যে এবার এ-ধারণা ছেড়ে দিতে হবে, কারণ 'চলাচলে'র মত গল্প একেবারেই অচল। পরে ভেবে দেখলাম আমার আগের ধারণাই ঠিক, প্রশ্ন কেবল প্রতিভার তারতম্যের। হয়ত রবীন্দ্রনাথ 'চলাচলে'র গল্পকেও স্টাইলের জোরে পড়বার মত করে তুলতে পারতেন।

এককালে বাংলাদেশে যক্ষ্মা, প্রেম ও সাহিত্যের মধ্যে খানিকটা যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। যক্ষ্মাকে তখন অনেকেই বিভীষিকা বলে দেখেনি, প্রেমের প্রথম সোপান বলে মনে করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অতসীমামী" কতকালের কথা। যুদ্ধের দুর্ভিক্ষের ধাক্কা খেয়ে যাবো সাহিত্য সাবালক হয়ে গেছে, আজ আর কেউ যক্ষ্মারোগীর প্রেম নিয়ে গল্প লিখতে বিশেষ সাহস পান না। লিখলেও তাতে রোমান্সের আমেজ থাকা প্রায় অসম্ভব। কোনো রুগীর প্রেমই যে খুব স্বাস্থ্যকর নয়, জীবনের অনুকূল নয় একথা কিছু সাবালকত্ব এলে বোঝা কঠিন থাকে না। এটা অবশ্য সাহিত্যের কথা বলছি। ডাক্তারেরা "অতসীমামী"-র যুগেও নিশ্চই রাজযক্ষ্মা আর রোমান্স-রোমাঞ্চ একপদে ভাবেননি। এক্স-রে প্লেটে অনেক ফুটো ফুসফুস দেখে আর অনেকের শরীরকে চুলচেরা করে নিশ্চই স্বাস্থ্যের প্রতি একটা শ্রদ্ধা জন্মায়। অথচ অসিত সেন-এর মধ্যে কিছু ক্ষমতা আছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু ক্যামেরার কাজে নয়, কোথাও কোথাও চিত্রনাট্যের ও পরিচালনার মধ্যেও সে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেছে। সিনেমা আর সাহিত্য যে এক জিনিস নয় তা তিনি ধরতে পেরেছেন, তাই মাঝে মাঝে তাঁর কাজে বিশুদ্ধ সিনেমার খোঁজ পাওয়া যায়। যেমন অবিনাশ-এর মৃত্যুর দৃশ্য থেকে শুরু করে মন্টুর এসে বৌদিকে খবর দেওয়া পর্যন্ত। একটি জোরালো রেখার মতো ঘটনা এখানে এগিয়ে গেছে। তা ছাড়া detail-এর ব্যবহারে মুন্সীয়ানা আছে, বাস্তব দৃশ্য তৈরীর ক্ষমতা আছে। রেল লাইনের ধারে অবিনাশের বাড়ীখানা জীবন্ত। বহির্দৃশ্যের আরো অনেক ঘটনা মনে রাখার মত। কলেজের ক্লাস, করিডরে

কথাবার্তা, হাসপাতালের অপরেশনের দৃশ্য রচনায় একটা বিশ্বাস্য ভাব আছে। ঘটনা ও সংলাপ যেখানে স্বাভাবিক সেখানেই অভিনয় ভাল, যেখানে ধরা ধরা গলায় ঘাড় কাত করে আদর্শবাদ সেখানে তাকে আর কে রক্ষা করতে পারে!

মোট কথা একটা অবিশ্বাস্য রকমের অবাস্তব, অতিরিক্ত ঘটনাবহুল এলোমেলো মধ্যঘোরানো গল্পকে নিয়ে বেশ আধুনিক বাস্তব চলচ্চিত্রধর্মী টেকনিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। নির্মলকুমারের একটি চোখের ওপরের পাতা একটু কুঁচলে পড়া (যেটা villain-এর চরিত্র-সৃষ্টিতে কায়দায় রপ্ত করতে হয়), এদিকে সরমার প্রতি গোড়ার ব্যবহারও ফাজিল ছোকরার মত, এতে কোনো দার্শনিক ভাবালুতা দেখা যায় না। অথচ সরমা তারই প্রেমের ভারে প্রপীড়িত। সরমার ভালর জন্য সে অন্যের সঙ্গে তার বিবাহ ঘটাল, আদর্শের এর চেয়ে পরাকাষ্ঠা আর কী হতে পারে। জীবনে যাঁদবা কেউ এমন কাজ করে তবে সে নিশ্চয় গা-ঢাকা দেয়, স্বেচ্ছায় নিজেকে ও প্রেমিকাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সেইখানে ওৎ পেতে থাকে না এবং অনবরত বাড়াঁতে আনাগোনা করে না। আর ডাক্তার (তা সে মহিলা হলেও) রুগীকে দেখে পরীক্ষা না করে স্টেথস্কোপ বার করে না। ডাক্তারীর রীতিই এই যে তাতে রুগীর প্রতি বন্ধুত্বটা বাইরের, রোগের সঙ্গে লড়াইটাই আসল। জীবনের রূঢ় বাস্তবতার এত কাছাকাছি তারা আসে যে তাদের আদর্শবোধ (যাঁদ থাকে) কাজে-ই প্রচ্ছন্ন থাকে, কথায় শোনা যায় না, বরঞ্চ কথায় খানিকটা সিনিসিজমই প্রকাশ পায়—এবং সেটাই স্বাভাবিক। পাহাড়ী সান্যাল এবং অরুন্ধতী তা করেন না কারণ তাঁরা আসলে ডাক্তার নন; ডাক্তার চন্দ্র সেই আদ্যিকালের ছাঁচ-ঢালা, ভাবে-ভোলা প্রফেসর, আর সরমা চিরাচরিত বাংলা ছবির ভাবার্দা নায়িকা। ডাক্তারীর গোটা ব্যাপারটাই বাইরে থেকে চাপানো, ক্যামেরার কেরামতির আর নতুনত্বের খাতিরে। জরামৃত্যুর মধ্যে বাস করে জীবনের পোড়খেয়ে যে চরিত্র তৈরী হয়, এরা সে জাতের চরিত্রই নয়। অসিত সেন অনেক বিদেশী ছবি দেখেছেন। অন্যদের মত তা থেকে চোরাই মাল আমদানী করেননি, অনেক জিনিস আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন গল্প কী করে তাঁর মনে লাগল এটা ভাববার বিষয়।

আসল কথা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের থেকে বাংলা চলচ্চিত্র অনেক পিছিয়ে আছে, তাই বিশ্ববছর আগে যা সাহিত্যে চলেছে তা আজকের চলচ্চিত্রে দেখি। বাংলা ছবিতে এখন "অতসীমামী"র যুগ হতে কোনো বাধা নেই। নিছক টেকনিক অনেকটা বাইরে থেকে শেখা যায়, কোনো উপলব্ধিকে বাদ দিয়েই। কিন্তু টেকনিক আর স্টাইল এক জিনিস নয়। মন আর মেজাজের মধ্যদিয়েই স্টাইল জন্ম নেয়, আর টেকনিক একটা যান্ত্রিক বুদ্ধিগত ব্যাপার। অসিত সেন চলচ্চিত্রের টেকনিককে অনেকটা ধরে ফেলেছেন। কিন্তু মন-মেজাজের ঘরে ফাঁক, সেজন্যেই সেখানে তাঁকে বাংলা ছবির সাবেকী কাঁচা সাহিত্যের মনোভাবে আশ্রয় নিতে হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পই ভাবের ব্যাপারে এক, কিন্তু রূপের ব্যাপারে আলাদা। দুটোই সমান জরুরী। প্রত্যেক শিল্পকে যেমন তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তেমনি সব শিল্পের যে সংবেদন তাকেও প্রকাশ করতে হবে। এই দুয়ের সংযোগেই তার সার্থকতা। অন্য শিল্পের থেকে চলচ্চিত্রের পার্থক্যের দিকটা যেমন জরুরী, মিলের দিকটাও তেমনি। অসিত সেনের ছবিতে পার্থক্যের দিকটা কিছু কিছু দেখা যায়, মিলের ঘর শূন্য। তাই তার সাহিত্য-ভাব কাঁচা।

অন্যান্য শিল্পের রসায়নে চলচ্চিত্র-শিল্পের উৎপত্তি, সেগুলি মন্থন করেই চলচ্চিত্রের চাবিকাঠির সন্ধান মেলে। আজকের অন্যান্য শিল্পের মান যে স্তরে উঠেছে, সে স্তরে না পৌঁছে কেবল যান্ত্রিক আপ্পিক দিয়ে চলচ্চিত্রের সার্থকতার ভরসা নেই। তাই বাংলা ছবির অচলায়তন ভেঙেছে 'পথের পাচালী'; আর 'চলাচল'-এর আসল বাসা তার ভেতরেই।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

আধুনিক সাহিত্য

আধুনিক প্রেমের কবিতা

অপর লেখকের রচনা-সঙ্কলন একপ্রকার সাহিত্য সমালোচনা বৈকি! রচনা নির্বাচনে কোন কোন সঙ্কলনকর্তা এমন পরিচ্ছন্ন ও প্রশিক্ষিত রুচির পরিচয় দিয়েছেন, এমন নিঃসংশয়ে তাঁদের সঙ্কলন অপর পাঠকের রুচি উন্নয়নের হেতু হয়েছে, যে লক্ষণীয় সমালোচনার সঙ্গে তাঁদের সঙ্কলনকর্ম অনায়াসেই তুলনীয় হতে পারে। ষোল বছর পূর্বে প্রকাশিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" আমাদের সাহিত্যের প্রশংসার্হ সঙ্কলনগ্রন্থ, আর সে-গ্রন্থের যুগ্ম সম্পাদকের একজন ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। অতএব আইয়ুব মহাশয়ের সম্পাদনায় "পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা" নামক যে সঙ্কলন-গ্রন্থখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে—সিগনেট প্রেসের সুরুচিবান প্রকাশন-আনুকূল্যে—সে-গ্রন্থ সম্বন্ধে কাব্যানুরাগী মাত্রেই নিশ্চয় উৎসাহিত ও উৎসুক বোধ করবেন।

উৎসাহ ও ঔৎসুক্যের দ্বিতীয় কারণও আছে। আইয়ুব মহাশয় তাঁর প্রথম সঙ্কলন-গ্রন্থের ভূমিকার শেষাংশে লিখেছিলেন :

> "তিনি (বুদ্ধদেব বসু) যে এখনো প্রেমের কবিতা লিখছেন এটা সৌভাগ্য বলেই গণ্য করি। বিষ্ণু দে'র সতর্কবাণী সত্ত্বেও যে 'প্রেমে পতন ছাড়া আর কিছুই নেই', আশা করি আমরা এখনও প্রেমে পড়ে থাকি। অথচ ঐ কথাটা উল্লেখ করতে আধুনিক কবিরা ঘৃণা বোধ করেন, যদি না ব্যঙ্গের গরজ থাকে। অবশ্য যে-সাহিত্য 'সখি, কী পুছসি অনুভব মোয়', 'সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিনু', 'হে নিরুপমা', 'বোলো, তারে বোলো', কিম্বা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য অনবদ্য গানে সমৃদ্ধ, সে-সাহিত্যে প্রেমের কবিতার অকূলান আছে এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু তাই বলে কি ঐ শব্দটা কাব্য সাহিত্য থেকে আজ একেবারেই নির্বাসিত হয়ে যাবে, সব জিনিষের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে যখন আমরা বিশ্বাসী, তখন কেমন করে বলতে পারি যে মানুষের প্রেম ব্যক্তিটাই যুগে যুগে অবিকল থাকে। নতুন কবিরা যদি নতুন করে প্রেমের কবিতা না লেখেন তাহলে আমাদের মনের কথা মনেই থেকে যায়, প্রকাশের আনন্দ পায় কেমন করে?"

এ-ভূমিকা লেখার ষোল বছর পরে আজ যখন আইয়ুব মহাশয় বিগত পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতার সঙ্কলন সর্বজন সমক্ষে উপস্থিত করেছেন, তখন স্বতঃই অনুমান হয় যে তাঁর মতে নতুন কবিরা নতুন করে প্রেমের কবিতা লিখছেন ও লিখছেন আর সে কবিতাগুলি কাব্যবিচারে সার্থক। যিনি ষোল বছর পূর্বে নতুন কবি রচিত প্রেমের নতুন কাব্যের প্রত্যাশায় ছিলেন, তাঁর সংস্কৃতিবান প্রত্যাশা কী পরিমাণে আজ পরিতৃপ্ত হয়েছে সে-বিষয়ে আমি অন্তত উৎসুক বোধ করেছি।

যে কোন কাব্য-সঙ্কলনের নির্বাচন নির্ভর করে সঙ্কলনকর্তার নিজস্ব রুচির উপরে। যেহেতু রসানুভূতি চরম বিচারে অনুভবকারীর রুচিসাপেক্ষ, আর রুচি ব্যক্তিস্বরূপের, personality-র, অচ্ছেদ্য অংশ, সেহেতু আমার নির্বাচন আমার অনন্য রুচির প্রতিবিম্ব,

আপনার নির্বাচন আপনার রুচির। যে-কাব্য কালপ্রবাহে ধৌত হয়ে, সুধীজনীন ঐকমত্য (আইয়ুব মহাশয়ের উক্তির অনুসরণ করছি) লাভ করেনি, সে-কাব্য সম্বন্ধে রুচিবৈষম্য তো প্রবল হবেই। বিচক্ষণ ম্যাথিউ আর্নল্ড এ-কারণে তাঁর "স্টাডি অব পোইট্রি" প্রবন্ধে সমসাময়িক কাব্যের অনিশ্চয়কুল ক্ষেত্র সাবধানে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। সমসাময়িক কাব্য-বিচারের দুঃসাহসিকতা সম্বন্ধে আইয়ুব মহাশয় খুবই সচেতন—তাঁর "পূর্বলেখ" (শব্দটি কি এস্থলে সুপ্রযুক্ত হয়েছে?) দ্রষ্টব্য। কোনো সহৃদয় শিষ্ট সমালোচক নিশ্চয় আশা করবেন না যে তাঁর ও আইয়ুব মহাশয়ের নির্বাচনরুচি হুবহু একপন্থী হবে।

কিন্তু হুবহু ঐকমত্য যদি না-ই বা হল, "সাম্প্রতিক রচনার পরখে অতি নৈকট্যের ফলে" দৃষ্টিভেদ যদিও বা ঘটে, সর্বসম্মতির আশা বা দাবী সঙ্কলনকর্তা যদি না-ই বা রাখেন, তবুও সঙ্কলনকর্তার সামাজিক দায়িত্ব হ্রস্ব বা অন্তর্হিত হয় না। আমার খুশিমতো আমার ঘরে বসে যে সঙ্কলন তৈরী করলাম তার নির্বাচনে আমার অনন্য রুচিই একমাত্র মানদণ্ড। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমি সঙ্কলনটি জনসাধারণে প্রকাশ করলাম, সে-মুহূর্তে আমার রুচি সাধারণ রুচির ব্যাপকতার কাছাকাছি আসতে বাধ্য। যদি আমার রুচিতে ও সাধারণ রুচিতে—সামাজিক রুচির যেটি norm, মানদণ্ড—পার্থক্য বড়ই প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলে সঙ্কলন ভূমিকায় সে-পার্থক্যের ব্যাখ্যা দেওয়া সঙ্গত। সঙ্কলনকর্তা ও পাঠকের মধ্যে একটা সৌজন্যের সম্পর্ক থাকা দরকার।

আমার এ-তর্ক আইয়ুব মহাশয়ের "পূর্বলেখ" ও "কবিতা ও প্রেম" শীর্ষক ভূমিকা-স্বরূপ প্রবন্ধ নিয়ে যতটা, বস্তুত তাঁর নির্বাচন সম্বন্ধে ততটা নয়। আমি সঙ্কলনকর্তা হলে আমার নির্বাচন কিছু ভিন্ন ধরনের অবশ্যই হত, কিন্তু সমালোচক হিসাবে আমি একথা মানব যে আইয়ুব মহাশয়ের নির্বাচন তাঁর সুরুচির পরিচায়ক আর এ-নির্বাচন আমি যাকে সামাজিক রুচির norm বলে জানি তার নিকটবর্তী। নির্বাচন সম্বন্ধে আমার সামান্য যে কয়েকটি আপত্তি আছে এখানে তার উল্লেখ করছি। অন্নদাশঙ্কর রায়ের "ক্লীডো" কি "বরণীয় রচনা"? অপরাজিতা দেবীর কাব্যগ্রন্থে "অভিমানিনী"র চেয়ে উৎকৃষ্ট কবিতা নিশ্চয় পাওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের "ধান কাটা হয়ে গেছে" কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা বলার মতো কোন পাঠগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আমি তো পাইনি। "হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ" এ-ছত্রটিকে সপ্রেম উক্তি ভাববার কী কারণ থাকতে পারে? অনুরূপ আপত্তি বিষ্ণু দে'র "আলেখ্য (২)" সম্বন্ধে। সুন্দর কবিতা, কিন্তু বিশেষ করে প্রেমের কি? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "বধূ" কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা বললে কি কবির শিল্পৈষণাকে খর্ব করা হয় না? আমার সব চেয়ে বড় আপত্তি রবীন্দ্রনাথের "ভক্ত" কবিতা সম্পর্কে। যে-অবোলা জীবের "অহেতুক প্রেম" লক্ষ্য হওয়াতে "সৃষ্টি মাঝে মানবের সত্য পরিচয়" কবির হৃদয়ঙ্গম হয়, তাকেও যদি প্রেম বলতে হয় তাহলে প্রেমের সংজ্ঞার্থ যায় বদলে। মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে স্নিগ্ধ সম্পর্ক, গাছপালা, চাঁদ নক্ষত্র, এমনকি রাস্তাঘাট সম্বন্ধেও নিবিড় প্রীতি, কেউ কেউ অনুভব করে থাকতে পারেন, করে থাকেনও, কিন্তু সেই প্রীতি ও সম্মোহকে প্রেম নামে অভিহিত করার পূর্বে আইয়ুব মহাশয়ের উচিত ছিল পাঠককে যথাযোগ্য নোটিশ দেওয়া। প্রেম বলতে যদিচ কেউ কেউ একটা দেহোত্তর বিমূর্ত শক্তি বুঝেছেন, যথা,—প্লেটো, স্পেনসার, শেলি—তবুও জগতের অধিক সংখ্যক মানুষ বুঝেছেন নরনারীর যৌন আকর্ষণ। সে-আকর্ষণে সহস্র বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, তার অসংখ্য প্রকারভেদ থাকতে পারে—প্রত্যেক সার্থক প্রেমিকের প্রেমবোধ অনন্য—আসল

কথা সে-আকর্ষণের গোড়ায় যৌনচেতনা, হয়তো বা সুপ্ত হয়তো বা প্রকট, হয়তো বা আদিম অসম্বৃত, হয়তো বা সৌকুমার্যে পরিশীলিত। প্রেমের উৎস যৌনচেতনায়, যদিচ প্রেম (বিশেষত আধুনিক সভ্যতার প্রেম) ও যৌনপ্রবৃত্তি সমার্থক নয়। আইয়ুব মহাশয় এ তথ্য জানেন না এমন কথা বলা অসহ্য ধৃষ্টতা মাত্র এবং যদিও তাঁর ভূমিকার শেষাংশে প্রেমানুভূতি সম্পর্কে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়েছেন, যদিও তার উক্তি আমি অন্তত মেনে নেব যে "প্রেমের সঙ্গে কোনো এক বা একাধিক জৈববৃত্তির সমীকরণ হয় অপবিজ্ঞান নয় অতিবিজ্ঞান", তবুও "প্রেমাস্পদ" ও "প্রিয়া" এই দুটি শব্দের পৌনঃপুনিক উল্লেখে একথাই প্রমাণ হয় যে আইয়ুব মহাশয়ের সংজ্ঞায় নর ও নারীর আকর্ষণেই প্রেমের সত্তা। অতএব প্রেমের কবিতার সঙ্কলনে কুকুরের প্রভুপ্রীতিঘটিত কবিতার অন্তর্ভুক্তি নিতান্তই উদ্ভট খামখেয়াল, আর—আইয়ুব মহাশয় মাফ করবেন—সে-খামখেয়াল হাস্যকরও বটে।

২

পূর্বে বলেছি সঙ্কলনটির কবিতা নির্বাচন আমি মোটের উপরে প্রশংসার্হ মনে করি। তবুও সক্ষোভে বলতে হচ্ছে যে "কবিতা ও প্রেম" শীর্ষক ভূমিকা-স্বরূপ প্রবন্ধটির অনুরূপ প্রশংসা করতে পারছি না। প্রবন্ধটির প্রথম ও দীর্ঘতর অংশে কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু সুষ্ঠু আলোচনা আছে সেটুকু আইয়ুব মহাশয়ের পূর্বতন সঙ্কলনের ভূমিকাতেও পাওয়া যায়, পাওয়া যায় বরং অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও প্রসাদগুণসম্পন্ন ভাষায়। বর্তমান প্রবন্ধটির ভাষা, আমার মনে হল, অস্বচ্ছ, অযথা বক্র, প্রয়াসক্লিষ্ট। ভাষা সব সময় যথাযথ (precise) হয়নি। প্রাসঙ্গিকতার (relevance) অভাবও লক্ষ করেছি। যে কথাগুলি স্বকীয় দায়িত্বে অনায়াসে বলা যেত, কেননা সেগুলি আজ বহুজনবিদিত, সেগুলি স্বকীয় দায়িত্বে বলার মতো আত্মপ্রত্যয় আইয়ুব মহাশয়ের মতো সুধী দর্শনবিদের কাছে আমরা প্রত্যাশা করি, সে-সব কথার স্বপক্ষে আইয়ুব মহাশয় কেন যে ভূরি ভূরি "অথরিটি" মানতে গেলেন তা বুঝলাম না। মালার্মে, মার্কস্, হেগেল (কান টানলে মাথা আসে), ক্রোচে, কলিংউড, ওয়াইট্‌হেড্ (পূর্বতন সঙ্কলনে দার্শনিকপ্রবরের নাম শুদ্ধমতে উচ্চারণ করার পরে বর্তমান ভূমিকায় আইয়ুব মহাশয় সহসা কি কারণে জার্মান-ঘেঁষা অশুদ্ধ উচ্চারণের পক্ষপাতী হলেন?), মিড্‌ল্‌টন্ মারি, অবশ্যই এলিয়ট, এবং কাসিরের্ (হ্যাঁ, কাসিরের্, কেননা অধুনা তিনি নবতম)—বড় অথরিটি অনেকেই উপস্থিত। মারিত্যাঁ, স্বোয়াইট্‌সার, কিএরকেগার্ড, উইটগেনস্টাইন—এঁরাও উপস্থিত থাকলে ১৯৫৬ সালের প্রামাণ্য অথরিটির সভা সম্পূর্ণ হত। এত অথরিটির সঙ্গে থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় বিধান, শঙ্করবেদান্ত, অনেকান্ত-বাদ, লজিক্যাল পজিটিভিজ্‌ম্, গ্রীক অনুকরণবাদ ("অনুকার" কেন?), কলাকৈবল্য, ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ মিলে "পরিস্থিতি" সাধারণ কাব্যামোদীর পক্ষে বড়ই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে কয়েকবারই মনে হয়েছে কত ভালোই না হত যদি আইয়ুব মহাশয় কাব্যস্বরূপ সম্বন্ধে নিষ্ফলা নিঃসিদ্ধান্ত আলোচনায় নিযুক্ত না হয়ে খাঁটি সাহিত্যিক আলোচনায় মনোনিবেশ করতেন—বাংলায় প্রেম-কাব্যের ঐতিহ্য, কাব্যে প্রতিফলিত বঙ্গীয় প্রেমের বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রতিক কাব্যে প্রেমের শিল্পরূপ, এ ধরনের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা। সম্ভবত এ-ধরনের আলোচনায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের সুযোগ থাকত না কিন্তু ব্যবহারিক বিচক্ষণতার অবকাশ থাকত। সম্ভবত এ-আলোচনা পাঠ্যপুস্তকগন্ধী হয়ে

পড়ত, কিন্তু তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হত না, সে-আলোচনা হত সাবয়ব (concrete), প্রত্যক্ষ, সঙ্কলিত কবিতাগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কশীল।

প্রবন্ধটির অনেকগুলি আপত্তিকর লঘুসূত্র উক্তির মধ্যে অল্প কয়েকটির উল্লেখ করছি : "মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌স্-এর ভাষায় তাকে [মানব সম্বিতকে] জড়জগতের মুকুর-বিম্ব বলা **অবশ্য** সোহহংবাদেরই উল্টোপিট, এবং **ভ্রান্তিবিলাসে** দুই-ই তুল্যমূল্য।" (বড় অক্ষর আমার করা)—মার্কস্‌বাদ ও বেদান্ত দুই-ই লেখক যদি বা চর্বণ করে থাকেন—কোন প্রমাণ পাইনি তার, আর খুব সুসাধ্য নয় সে কাজ—দুটি দার্শনিক মতবাদেই ভ্রান্তি, শুধু ভ্রান্তি নয় ভ্রান্তিবিলাস, আর সে-ভ্রান্তিবিলাসের স্বরূপ উভয় মতবাদে তুল্য, এহেন নির্দ্বিধ উক্তিতে, লেখকের দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে নিদারুণ সংশয় জাগে। "আমি অনেকান্তবাদে বিশ্বাসী। **অবশ্য** এই অনেকান্ত সত্যগুলি সকল বিরোধ ও বিচ্ছেদের শেষে **হয়তো** কোনো এক মহা-সত্যে গিয়ে মিলে যায়। কিন্তু সে তো ধর্মবিশ্বাসের কথা, যোগজ প্রত্যক্ষের ব্যাপার। ব্যাপার। আমাদের মুখে সে-কথা শোভা পায় না।"—"অবশ্য" ও "হয়তো"র মর্মান্তিক যোগাযোগ ছেড়েই দিলাম। অনেক সত্য মিলে গিয়ে এক মহাসত্যে মহীয়ান হয়ে উঠতে পারে একথা কেবল ধর্মবিশ্বাসের কথা নয়, মেটাফিজিক্‌সের কথা ঠিক ততটাই যতটা প্লুরালিজ্‌ম্—সে-কর্তও ছেড়ে দিলাম, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে-লেখক তাঁর এই বাক্য-গুলির মধ্যে যুক্তিবিরোধিতা লক্ষ করেননি।

"প্রাচীন গ্রীকদের অনুকারবাদ পরবর্তী গ্রীক দার্শনিকরাই মেনে নিতে পারেননি।" —পরবর্তী কোন্ উল্লেখযোগ্য গ্রীক দার্শনিকরা? আরিস্‌টট্‌ল্ স্বয়ং অনুকরণবাদের সমর্থক, বস্তুত অনুকরণবাদের সাহায্যেই তিনি প্লেটোর বিখ্যাত কবি-বিরোধের মীমাংসা করেছেন। তাঁর এ-মীমাংসা পরবর্তী কালে গ্রীসে, রোমে, মধ্যযুগীয় খৃষ্টানী শাস্ত্রপীঠে, আরব চিন্তাজগতে ("পোয়েটিক্‌স্" গ্রন্থটির জন্য আমরা আরবদের কাছে ঋণী), রেনেসাঁস ইতালীতে, সতেরো আঠারো শতকের ফ্রান্সে ও ইংল্যাণ্ডে, প্রায় অপ্রতিহত প্রাধান্য লাভ করেছিল। আরিস্‌টট্‌ল্-পরবর্তী প্লটাইনাস ও ক্রাইসস্‌টম্ অনুকরণবাদ অগ্রাহ্য করেননি, অনুকরণবাদের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

অন্যত্র (২১ পৃষ্ঠায়) আইয়ুব মহাশয় উনিশ শতকের একটি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ করে বলেছেন এ-মতবাদ "সুখবাদী অপব্যাখ্যা", এ-মতে বলা হয় "আমাদের মহত্তম কর্মেরও চূড়ান্ত অভিপ্রায় আত্মতুষ্টি"। অনুমান হয় ওয়াল্টার পেটারের মতবাদ লেখকের স্মৃতিপথে উদিত হয়েছে। পেটারের এই মত আদৌ ব্যাপকগ্রাহ্যতা লাভ করেনি এবং সমগ্র উনিশ শতকের মূল দর্শনধারাগুলি—যেগুলির সঙ্গে বেন্‌টাম্, মিল, স্যাঁৎ সিম°, কোঁৎ, স্পেন্সার, মার্কস্ প্রভৃতি নাম জড়িত—আত্মতুষ্টির বিপরীত পথেই চলেছিল। কলা-সৃষ্টির অপব্যাখ্যাকারী কোন্ কোন্ সাহিত্যিকের কথা আইয়ুব মহাশয় ভাবছেন জানি না, সম্ভবত বেয়ার্ড্‌স্‌লে-ওয়াইল্‌ড্-সিমন্‌স্ গোষ্ঠীর কথা, কিন্তু এঁদের তরলচরিত্র উন্মার্গ-প্রবণ আচরণের সঙ্গে পেটারের দর্শন জুড়ে দেওয়াতে না পেটারের প্রতি সুবিচার হয়েছে ("মারিয়াস্ দি এপিকিউর" পঠিতব্য) না ওয়াইল্‌ড্ গোষ্ঠীর প্রতি। আরো দুর্বিচার হয়েছে "এই সুখবাদী অপব্যাখ্যা"র সঙ্গে ড্রাইডেনের উক্তির আকস্মিক সম্পর্ক স্থাপনে। Dulci ও Mtile এ-দুয়ের সম্পর্ক বিষয়ে শিল্পরসিক মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই অবহিত, ড্রাইডেনের কাল থেকে নয়। Dulci-পন্থীদের "সুখবাদী অপব্যাখ্যা"কারীদের সমগোত্রীয় করায় বড়ই দার্শনিক অনবধানতা প্রকাশ পেয়েছে। অনবধানতাবশত প্রবন্ধকার

আরেকটি মন-গড়া কথা বলেছেন যে সাহিত্যিক সুখবাদীদের "পক্ষে **স্বভাবতঃই** [বড় অক্ষর আমার করা] একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। রুদ্র বা করুণ রসাত্মক সাহিত্য, *King Lear, Crime and Punishment*, "শ্যামা" প্রভৃতির মূল্যায়ন।" আশ্চর্য, আশ্চর্য উক্তি! আমার যে সামান্য পড়াশুনো আছে তাতে এমনি ধারণা কখনো হয়নি যে আনন্দমার্গী সাহিত্যিক ("সুখবাদী" কথাটি আমার মনঃপুত হচ্ছে না) উপযোগবাদী সাহিত্যিকের তুলনায় রুদ্র বা করুণ রসাত্মক সাহিত্যের মূল্যায়নে অধিক বিভ্রান্ত। বহু ঐতিহাসিক নজির দেখিয়ে বর্তমান আলোচনা ভারাক্রান্ত করব না, সুদ্ধ একটি প্রশ্ন মনে আসছে, শেক্‌স্‌পীয়রের লীয়র সম্বন্ধে নির্বোধ উক্তি করেছিলেন কে, বিশুদ্ধ কলাবাদী ব্র্যাড্‌লি, অথবা নীতিমার্গী টলস্টয়?

৩

এতদূর লেখার পরে মনে হচ্ছে প্রবন্ধটি অসন্তোষপ্রধান হয়ে পড়েছে। অসন্তোষ প্রকাশের জন্য আমি দুঃখিত নই কিন্তু প্রবন্ধে দুর্বিনয় বা ধৃষ্টতা থেকে থাকলে পরিতাপের বিষয় হবে বৈকি! অসন্তোষের কারণ স্বচ্ছ। অনেকের মতো আমি আইয়ুব মহাশয়ের মনস্বিতার অনুরাগী। আলোচ্য কাব্য-সঙ্কলনের সম্পাদনাকর্মে তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিলাম অনেক, বিশেষত যে-ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বতন সম্পাদনার নজির বর্তমান। এ-জন্যেই "কবিতা ও প্রেম" শীর্ষক প্রবন্ধটির বহুমুখীন দুর্বলতা পীড়াদায়ক। আমার ভরসা সঙ্কলন-খানির আরো অনেক সংস্করণ হবে আর আইয়ুব মহাশয় তখন বিচার করে দেখবেন প্রবন্ধের লঘুগ্রন্থিগুলিকে দূঢ় ও ভারসহ করা যায় কিনা।

ভূমিকা-স্বরূপ প্রবন্ধটির মূল্য যা-ই হোক, সঙ্কলনটি মোটের উপরে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতগুলি শিল্পসমৃদ্ধ কবিতা, যার সব কয়টি একই মূল উৎসজাত, একই সঙ্কলনগ্রন্থে আমাদের কাছে পরিবেশন করার জন্য কাব্যানুরাগী পাঠক মাত্রেই আইয়ুব মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

৪

শিল্পজগতের চিরন্তন কিন্তু সীমিত কয়েকটি বিষয়বস্তুর অন্যতম প্রেম। প্রেমের অভিব্যক্তি নেই এমন কোন শিল্পরূপ নেই। প্রেমের অভিব্যক্তি নেই এমন কোন সাহিত্য আছে বলে আমি জানি না। কাব্যে হৃদয়াবেগের প্রকাশ, আর প্রেমানুভূতিতে হৃদয়াবেগ পরিস্ফুট। সে-কারণে লিরিক কাব্য প্রেমপ্রবল, অন্যান্য প্রকার কাব্যেও প্রেমের উপস্থিতি অল্পবিস্তর অবধারিত। মানুষের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অসংখ্য কোটি নরনারীর হৃদয় যে-প্রেমানুভূতিতে উদ্বেল হয়েছে, কাব্যে ও অন্যান্য শিল্পে সে-প্রেমানুভূতির যতটুকু প্রকাশ আমাদের আয়ত্তসাধ্য, সে-প্রেমানুভূতির কয়েকটি মূলরূপ (type) আমরা সহজেই নির্ণয় করতে পারি। প্রেমোপলব্ধির বিস্ময়, হর্ষ, উন্মাদনা, ব্যাকুলতা, তার মিলন, বিরহ, তার সম্ভোগ, তার বিক্ষোভ, প্রেমিকের অভিমান, অভিসার, সঙ্কোচ, শঙ্কা, প্রেমের আরো কতনা সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য, কোন না কোন সজ্ঞায় সর্বদেশের সাহিত্যেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমের জাতিভেদ নেই, দেশভেদ নেই, প্রেম কালসীমিত নয়। প্রেমের আবরণ মানবিক। প্রবৃত্তির

যে-অবিচ্ছেদ্য কারাগারে মানুষকে নির্মম বিধাতা বন্দী করেছেন, যৌনলিপ্সার সে-কারাগার থেকে মুক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসকেই বলি প্রেম নামক সভ্য চিত্তবৃত্তি। অন্যান্য আরো কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে মার্জিত তদনুরূপ চিত্তবৃত্তিগুলির যে সম্পর্ক, প্রেম ও তার মূলে যৌনবোধে সে-সম্পর্কই বিদ্যমান। মূলকে ভুলে যাওয়া তেমনই অবাস্তব যেমন মূলেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা। শিকড় ছাড়া গোলাপ ফোটে না কিন্তু গোলাপ শিকড়ও নয়। প্রেমে যৌনচেতনার পরম রূপান্তর। যদি এ-রূপান্তরের কৃতিত্ব দিই মানুষকে তাহলে—বুদ্ধদেব বসুর অনুসরণে—বিনা দ্বিধায় বলব, স্রষ্টার চেয়ে অধিক সৃষ্ট-র মাহাত্ম্য।

প্রেমের সৌকুমার্যে সভ্যতার মানদণ্ড। প্রেম দেশকালোত্তর, বিশ্বজনীন। প্রেমে প্রেমিক আপন মানবিকতা পরিস্ফুটরূপে উপলব্ধি করেন। সার্থক প্রেমে মানুষের মহত্ত্বলাভ হয়, আর সে জন্যই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির এষণা যখন মানবোত্তর চিত্তবৃত্তিতে পরিশোধিত হয় তখনই তাকে বলি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি। তুলসীদাসের কাহিনী, ইংরেজ কবি ডান্‌-এর কবিকর্ম, বস্তুত বহু যৌনপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম সংক্রান্ত কবিতায় তুলনাত্মক আলোচনা থেকে অনুমান হয় যে নারীপ্রেমের sublimation-এ ঈশ্বরপ্রেম।

প্রেমের এই সংক্ষিপ্ত স্বরূপচিন্তন থেকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব। যদি লক্ষ রাখি প্রেমের গূঢ় আবেগের প্রতি, তাহলে সে-আবেগের প্রকাশ যে-কোন ভাষায় যে-কোন কালে সমতুল্য। যে ইহুদী যুবতী একদা By the Waters of Babylon অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন তাঁর সমগোত্রীয়া তরুণী পরবর্তীকালে অন্য দেশেও চিত্তবৈকল্য বোধ করেছিলেন। "মৈমনসিংহ-গীতিকা"-র প্রণয়িনীতে ও ইংরেজি ব্যালাড-কাব্যের প্রেমিকায় কোন দুস্তর ব্যবধান নেই। বিদ্যাসুন্দর ও অভিভূ, দাশু রায় ও ভিক্টরীয় স্প্রীট সিংগার্‌স্‌, প্রেত্রার্ক ও কোন কোন বৈষ্ণব কবি, তুল্যভাবে প্রকাশ করেছেন প্রেমের বেদনা ও আনন্দ।

কিন্তু বিশ্বজনীনতা প্রেমের শিল্পরূপের সবখানি কথা নয়। প্রেমের গূঢ় স্বরূপ দেশকালোত্তর বিশ্বজনীন বটে, কিন্তু যেহেতু প্রেম প্রেমিকেরই চিত্তবৃত্তি, আর প্রেমিকের চিত্তবৃত্তি ও চরিত্র তদীয় আবেষ্টনীর সঙ্গে জড়িত, সেজন্য প্রেমের বহিঃপ্রকাশে দেশকাল-প্রভাব, অনন্যতা, অতুলনীয়তা বিদ্যমান। অভিভূ ও ভারতচন্দ্রে মৌল প্রেরণা তুল্য, অথচ সে-প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ একক্ষেত্রে আঠারো শতকী বঙ্গীয়তায় ও অপরক্ষেত্রে রোমান চারিত্র-ধারায় সুরভিত। বস্তুত প্রেমের কাব্যে তিনটি ভাবস্তরের সংযোজনা লক্ষণীয়। স্তরগুলি পৃথক ও স্বসম্পূর্ণ নয়, বরঞ্চ তারা বিস্ময়কর ও প্রায়-অবিশ্লেষণীয় উপায়ে নিয়ত একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়। সতর্ক ও সংবেদনশীল পাঠক প্রেমের কাব্যে আবিষ্কার করবেন প্রেমের ঐকান্তিক অনন্যতা—যা কেবলমাত্র ঐ বিশেষ প্রেমবিষয়ক কাব্যেই উপস্থিত; প্রেমের দেশকালধর্মিতা—যা ঐ কাব্যের জড়জাগতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবধন্য; প্রেমের বিশ্বজনীনতা যার গূঢ় মৌলচেতনা দেশকালোত্তর, যা ব্যক্তির ও সমাজের ওপারে ভূমার বিশালতায় নিবেদিত। এ তিন স্তরের মায়াবী মিশ্রণ সে-পাঠকের লক্ষীভূত হবে যিনি বাংলা প্রেমের কাব্য সবিস্তারে ও নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করবেন।

আশা ছিল আইয়ুব মহাশয়ের সম্পাদকীয় রচনায় বাংলা প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অন্তত কিছু ইশারা পাব। সে-ঐতিহ্যের জ্ঞান না থাকলে আলোচ্য সঙ্কলনের কবিতাগুলির মূল্যায়ন দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে। আইয়ুব মহাশয় আমাদের সে-আশা পূর্ণ করেননি। ক্ষোভের বিষয়। ক্ষোভের বিষয় কেননা বর্তমান সম্পাদনাকার্যে এমন কোন প্রমাণ পেলাম

না যাতে বলতে পারি যে যে-পরিমাণে সম্পাদকের রুচি প্রশংসনীয় তাঁর সমালোচনা-কুশলতা সে-পরিমাণেই আদরণীয়। বিষয়নিষ্ঠ সংকলনগ্রন্থের ভূমিকা লেখার সুন্দর নমুনা আইয়ুব মহাশয় পেতে পারতেন লর্ড ডেভিড সেসিল সম্পাদিত "অক্সফোর্ড বুক অব্ ক্রিশ্চিয়ান্ ভর্সে"। যে-কর্তব্য আইয়ুব মহাশয় অসম্পূর্ণ রেখেছেন তার দায়িত্ব আমার এ-আলোচনার প্রচলিত বৃত্তসীমা ছাড়িয়ে গেছে। আশা রাখছি আইয়ুব মহাশয়ের ও আমার চেয়ে অধিকতর সুধী, অধিকতর কর্তব্যনিষ্ঠ কাব্যালোচকের কাছে আমরা কোনদিন পাব প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনা। বর্তমানে সে-বিষয়ে সামান্য দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ করেই আমি ক্ষান্ত থাকব, মন্তব্যগুলি এম্পিরিক্যাল উক্তি মাত্র, কৃতসংকল্প গবেষণার অবধারিত সিদ্ধান্ত নয়। মনে হয় বাঙালী চিত্ত প্রেমানুভূতির সহজ ও উর্বর ক্ষেত্র। প্রাক্-বৈষ্ণব যুগে দেশে প্রেমকাব্য কি পরিমাণে চল্‌তি ছিল জানি না, এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রায় অনুপস্থিত, কিন্তু নরনারীর প্রেমবিষয়ক কাব্যের উদাহরণ দেশী ও বিদেশী অন্য অনেক কাব্যেই—যথা হিন্দী, ইংরেজি—ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে নিতান্ত বিরল। সংস্কৃত কাব্যে যতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ডাঃ নীহার রায় মহাশয়ের ইতিহাসগ্রন্থের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালী জীবনের যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে এমন অনুমান সংগ্রহ অসংগত হবে না যে সে-সব যুগে বাঙালীজীবন ছিল প্রেমানুভূতির অনুকূলে, আর হয়তো সে-অনুভূতি বাঙালীর তৎকালীন সাহিত্যে, বিশেষত গানে, প্রকাশ পেয়েছিল যদিচ সে-সাহিত্য আজ অবলুপ্ত, বিস্মৃত। বৌদ্ধ প্রভাবে সামাজিক জীবন ছিল অনেকাংশে ডেমোক্র্যাটিক। শ্রেণীবৈষম্য উগ্র, এমনকি প্রকট, ছিল বলে মনে হয় না। নরনারীর স্বচ্ছন্দ মেলামেশায়—অন্ততপক্ষে গ্রামাঞ্চলে, অর্থাৎ দেশের প্রায় সর্বত্রই—তেমন কোন বাধা ছিল না। যে-অসংখ্য অন্তর্নিষেধে (inhibition) বর্তমান সমাজ অহর্নিশি দ্বিধাবিভক্ত, তার নিষ্পেষণে মানুষের চিত্তবৃত্তিগুলি (বিশেষত, নরনারীর সামাজিক সম্পর্কসংশ্লিষ্ট চিত্তবৃত্তিগুলি) স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য হারায়নি। কৃষিকর্মে, নৌকর্মে, গ্রাম্য সমাজের বহু বৃত্তিতেই নর ও নারী কাজ করত সমতালে, তাদের মেলামেশায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ছিল কমই। অনুমান করতে পারি সেকালে প্রেমের নিগড়ে আবদ্ধ হত বহু তরুণ তরুণী, অনেকে হয়তো গান বাঁধত, পালাগান অথবা গীত, আর সে-গানের মাধ্যমে প্রকাশ করত আপন প্রেমানুভূতি। আরো অনুমান হয় সে-প্রেম ছিল ঘরোয়া প্রেম, সাধারণ মানুষ মানুষীর প্রেম। কোনো উত্তুঙ্গ amor intellectualis dei নয়, যে-নির্বস্তুক প্রেমের ধারণায় চিত্তবৃত্তি চলে যায় জড়জগতের অতীত কোন মনোনির্ভর রাজ্যে সে-প্রেম নয়, বরঞ্চ প্রত্যক্ষ প্রিয় বা প্রিয়ার সদেহী প্রেমই অনুক্ষণ যে-প্রেমের কাম্য, যে প্রেম "বিবাহের চেয়ে বড়ো" নয় বরঞ্চ বিবাহে ও গার্হস্থ্যধর্মে আবিষ্কার করে প্রেমের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক পরিণতি, যে-প্রেম প্রিয়তম বা প্রিয়তমার সঙ্গে সুখনীড় রচনার কল্পনায় বর্ণাঢ্য, সেই কখনো সলজ্জ সঙ্কুচিত ভীরু মৃদুবাক্, কখনো উচ্ছ্বসিত বলিষ্ঠ কথনবিলাসী প্রেম সে-কালের বাংলা সমাজে অজ্ঞাত ছিল এমন অনুমান হয় না কেননা সে-প্রেমের রেশ বাজে বৈষ্ণবোত্তর প্রেমকাব্যে, পল্লীকাব্যে, আজ অবধি। সেকালের প্রেমকাব্যের উদাহরণ যদিচ সাহিত্যের ইতিহাসে পাই না, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি সেকালের সামাজিক ইতিহাস ও আধুনিক কাব্য-প্রকৃতির তুলনাত্মক আলোচনায়।

এই ঘরোয়া প্রেমের সঙ্গে অবশ্য অনেক সময় মিশেছে sophisticated নাগরিক প্রেম। সংস্কৃত প্রেমকাব্যের প্রভাব নিশ্চয় সেকালেও আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করেছিল। কালক্রমে সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে (অন্যান্য অনেক সাহিত্যের বেলায়ও তাই)

দেখা দিল শ্রেণীচেতনাজনিত এক দ্বৈততা, সাহিত্যের ও লোকসাহিত্যের, বর্ণসাহিত্যের ও নির্বর্ণসাহিত্যের, দ্বৈততা। রবীন্দ্রনাথে ও ভাটিয়ালির অখ্যাতনামা রচয়িতায় যে-পার্থক্য সে-পার্থক্যই বর্তমান সাহিত্যে ও লোকসাহিত্যে। যাকে বলি সাহিত্য, নানা কারণে তা নাগর সভ্যতায় গ্রাহ্য ও লিপিবদ্ধ হয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে এসেছে আমাদের কাছে, ইতিহাসে তার স্থান নির্দেশিত। যাকে বলি লোকসাহিত্য তা জন্ম নিয়েছে, বেড়ে উঠেছে, শক্তি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে দূরে, তা প্রচলিত হয়েছে লোকমুখ থেকে লোকমুখে কিন্তু অধিক স্থলেই তা লিপিবদ্ধ হয়নি কেননা কবিগণ ও শ্রোতাগণ লেখনব্যাপারে ছিলেন সমান রকমে অপারগ। কালের কৃষ্ণচ্ছায়া থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত এই লোকসাহিত্যের যে-সামান্য অংশ আমাদের কাল অবধি পৌঁছেছে তা থেকে প্রাচীন প্রেমকাব্যের ধারা সম্বন্ধে কিছু আনুমানিক ধারণা করা সম্ভব। সে-প্রেমের ধারা স্নিগ্ধ, নম্র, অনুগ্র, সে-প্রেম বাংলার গ্রামীণ জীবনের পরিবেশের সঙ্গে একান্তে মিশ্রিত, যে-পরিবেশ এক হিসাবে বড়ই অবিচিত্র অথচ বাঙালীর পক্ষে যার আকর্ষণ ও নবত্ব নিরবশেষ, সে-প্রেম ঘর বাঁধার অভিলাষী, ঘর ভাঙে না; সে-প্রেম বিরহ, ব্যর্থতা বিনাশ নিয়ে আসতে পারে কিন্তু আত্মায় জ্বালা ধরায় না। এ-প্রেমের আভাস পাওয়া যায় মৈমনসিংহ গীতিকায়, কোন কোন মঙ্গলকাব্যে, ঠাকুরমা ঠাকুরদার গল্পে।

প্রেমের অভিব্যক্তি সাধারণ লোকচিত্তে যেমন হয়েছিল, সমাজের উচ্চস্তরের সংস্কৃত-চিত্তে তেমনটি হয়নি বলেই মনে হয়, যখন লোকসাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণব-কাব্যের তুলনা করি। লোককাব্যের প্রেম দেহ-সমুখ কিন্তু দেহ-সর্বস্ব ছিল না, কিন্তু যেটুকু দেহচেতনা লোককাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, মনে হয় মার্জিতকাব্যে সেটুকু প্রকাশ সম্বন্ধেও কবিরা কোন প্রকার নিষেধ সচরাচর বোধ করতেন। ব্যক্তিগত প্রেম প্রকাশ সম্বন্ধে যেন একটা খুঁতখুঁতি, একটা বাধা বোধ করতেন মার্জিত কবি। এই নিষেধজ্ঞান কোন সামাজিক কারণে অথবা ধর্মীয় কারণে নিহিত কিনা, অথবা তদানীন্তন নন্দনচেতনার সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল কিনা বলা আমার সাধ্য নয় কিন্তু মনে হয় এরকম কোন নিষেধজ্ঞানের বশবর্তী হয়েই ষোল শতক ও তৎপরবর্তী কালের অগণিত কবি সরাসরি ব্যক্তিগত প্রেমকাব্য রচনায় নিযুক্ত না হয়ে আপন প্রেমানুভূতি প্রকাশের জন্য অবলম্বন করেছিলেন রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান। কৃষ্ণ-ভক্তি অবশ্য হিন্দুধর্মের গভীর ও ব্যাপক তত্ত্ব। সে-তত্ত্বের আধ্যাত্মিক সংকেত ও ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক কাব্য রচিত হয়েছে, হিন্দী সাহিত্যে, বাংলাতেও। এ-কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ পাওয়া যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনে, আর এ-ও লক্ষ করি যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাব্য ছাড়া যেন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য প্রেমকাব্য তখনকার দিনে মার্জিত সাহিত্যে ছিল না। রাধাকৃষ্ণের প্রেম মার্জিত সাহিত্য থেকে উপ্‌চে পড়েছিল লোকসাহিত্যেও। বাঁশি বাজানো কালিয়ার মোহ নিয়ে গান বেঁধেছিল অনেক অজ্ঞাতনামা কবি—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। অনুমান হয় যে বৈষ্ণবকাব্যে ধর্মীয় তত্ত্বটা সব সময়ে কবির কাছে (পাঠকের কাছেও) সে-পরিমাণে মুখ্য ছিল না যে-পরিমাণে ছিল তার মানবিক প্রেমলীলার আবেদন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনীতে মিলল বাঙালীর প্রেমভাবনার ধ্রুব রূপক। স্ব-নামে, স্ব-রূপে যে-প্রেম ব্যক্ত হয়নি, তার নিষেধশঙ্কাহীন প্রকাশ পেলাম এই সর্বজনগ্রাহ্য রূপকে। দেবতার প্রেম হল মানুষ-মানুষীর প্রেম। আর বৈষ্ণবযুগের নব্যন্যায়শিক্ষিত, বিশ্লেষণপটু, রসশাস্ত্রবেত্তা, মার্জিত কবি নরনারীর প্রেমের কত না সূক্ষ্ম ও সুকুমার রূপের সন্ধান পেলেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমে! প্রেমের আনন্দ ও বেদনার, মিলন ও বিরহের, অভিমান ও সমর্পণের কত ভাগ ও

অনুভাগ, কত মিশ্র অনুভূতি, ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করল, সুনির্ধারিত হল কোন্ কোন্ পরিবেশে সে-সব প্রেমাচরণ সমুচিত! প্রেমাভিব্যক্তির বৃহত্তম ও জটিলতম convention সৃষ্ট হল বাঙালীর কীর্তনসঙ্গীতে। প্রেমকাব্যের এত পরিমার্জন ও নিয়ন্ত্রণ, এমন বহুপল্লব প্রকাশ ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় কাব্যেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, আমি অনন্ত পাইনি "রোমান্ দ্য লা রোজ"-এ অথবা পেত্রার্কের কাব্যে।

আমার মনে হয় বাংলা প্রেম-কাব্যে দুটি সুস্পষ্ট ধারা : একটিকে বলি সহজ ঘরোয়া প্রেম, অপরটি অতি সচেতন, পরিমার্জিত, রূপকপরায়ণ, নাগর প্রেম। দেহপ্রবল প্রণয়ের যে-প্রকাশ ভারতচন্দ্রে তাতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব যতটা, সহজ প্রেমধারার প্রভাব সম্ভবত তার চেয়ে কম নয়, আর অবশ্য প্রবল তো ছিলই তদানীন্তন সামাজিক আচরণ ও রুচির প্রভাব। উনিশ শতকে ভব্যসাহিত্যের রুচি ও গতি বদলালো অনেক পরিমাণে। নবলব্ধ ইংরেজি শিক্ষায় মার্জিতরুচি কাব্যানুরাগী লোকসাহিত্য সম্বন্ধে বোধ করলেন উন্নাসিক অবজ্ঞা, লোকসাহিত্য দরিদ্র কুটুম্বের মতো দিনযাপন করতে লাগল সাহিত্যের ইমারতের এক অন্ধকার কুঠুরিতে। ঈভাঞ্জেলবাদী খৃষ্টধর্মের ও বাঙালী ব্রাহ্মধর্মের অতি নৈতিক প্রভাবে প্রেমকাব্য সম্বন্ধে ইংরেজিনবিশ বাঙালীর শুচিতা ও সঙ্কোচ বাড়ল প্রচণ্ড রকমে। সমসাময়িক ইংরেজি কাব্য থেকেও তেমন কোন সাহায্য পাননি বাঙালী কবি। মনে রাখতে হবে যে উনিশ শতকে কীট্স্, রোসেটি ও সুইনবর্ণ ছাড়া অন্য সব ইংরেজ কবির প্রেম-কাব্য দেহচেতনা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, সঙ্কুচিত, নির্লিপ্ত। শেলির প্রেম বিদেহী, ভাবলোকবাসী। কীট্স্ সম্বন্ধে আধুনিক মূল্যায়ন তখন বলবৎ ছিল না; একথা রোসেটি সম্বন্ধেও খাটে। টেনিসনের প্রেম সুশ্লীল কিন্তু রক্তাল্পতায় পীড়িত। উনিশ শতকের বাঙালী যে ব্রাউনিং বা রোসেটির কাব্য বিশেষ পড়তেন তেমন মনে হয় না। সে যাই হোক, এমন অনুমান সম্ভবত অসঙ্গত হবে না যে সদ্যোলব্ধ পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সে-যুগে প্রেমকাব্য সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর চিত্ত ছিল শুচিতাক্লিষ্ট ও অনাগ্রহী। বাঙালী তখন মিল্ ও স্পেন্সার্, কোঁৎ ও কার্লাইল্, রাস্কিন ও জর্জ এলিয়ট প্রভৃতির বিশিষ্ট চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত, অতি "সীরিয়াস্"-মনস্ক গ্রন্থোৎসাহী বাঁধা পড়েন না প্রেমকাব্যের লঘু ও চপল মায়ায়। বস্তুত উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে প্রেমের স্থান মহৎ ও স্মরণীয় নয়। বিহারীলাল থেকে প্রেম আবার পেল সার্থক ও বরণীয় কাব্যবিষয়ের মর্যাদা, সে মর্যাদা আরো ঘনীভূত হল, মহত্তর হল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। প্রেমকাব্যের আবার এক ধারা বেড়ে উঠল বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, এ-ধারা প্রধানত ভাববিলাসী, সচরাচর দেহচেতনা ও জড়জাগতিক স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে, যদিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাঁর আবেগশীল দেহচেতন অলজ্জ প্রেম অনুপস্থিত নয়। এ-প্রেমবোধ বৈষ্ণব-কাব্যের মতো রূপকপরায়ণ বক্তার্থ-নির্ভর নয় বটে, এ-কাব্যের প্রিয় বা প্রিয়তমা মানুষ মানুষী বটে, মানুষের বেশে দেবদেবী নয়, কিন্তু তবুও এ-কাব্যে বাস্তব প্রত্যক্ষ তথ্য এড়িয়ে প্রধানত প্রেমের অবরাজি নিয়ে ব্যস্ত থাকার নিরন্তর প্রয়াস লক্ষ করি। উচ্ছ্বাস ও আবেগের সূক্ষ্মতা, তীব্রতা, নিবিড়তা, প্রাবল্য, সবই পাওয়া যায় প্রেমকাব্যের এই ধারায়, অনুভূতির এত সুকুমার শিল্পরূপ অন্য প্রেমকাব্যে বিরল বটে, তবুও বলতে হয় যে এ-কাব্যের প্রেমে অবয়বতার (concreteness) অভাব। এ-প্রেমাবেগ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে শরীরী প্রিয় বা প্রিয়ার জন্য নয়, ভাবলোকবাসী প্রেমের জন্য, মানসসুন্দরীর জন্য। এ-নিরবয়ব প্রেম কয়েক দশকের জন্য বাংলা কাব্যের প্রধান প্রেমবস্তু হয়ে উঠ্‌ল, পূর্ববঙ্গীয় কবি গোবিন্দদাসের প্রত্যক্ষ সাবয়বী

প্রেম কোনরকম প্রতিযোগিতা করতে পারল না এর সঙ্গে, হয়তো যেহেতু রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁর করণকৌশল, তাঁর ভাষা রীতিমতো অপকৃষ্ট, অথবা যেহেতু তাঁর সাবয়বী প্রেমে তৎকালীন সাহিত্যিক রুচি সন্তুষ্ট হয়নি।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে প্রেমকাব্যের ধারা কোন্ পথে চলল? সে-প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে জানতে হবে রবীন্দ্রোত্তর কবি কারা? লক্ষ করছি যে "আধুনিক বাংলা কবিতা" ও "পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা" নামক দু'খানা কাব্য-সঙ্কলনেই রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত, যথাযোগ্য গৌরবেই উপস্থিত যদিও প্রথম সঙ্কলনের অন্যতম সম্পাদক বলছেন, "রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে অল্পবিস্তর যাঁরা মুক্ত হয়েছেন বা হতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরই লেখা থেকে এ-সঙ্কলন, অথচ এখানে সর্বাগ্রে পাওয়া যাবে সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্রনাথকে।" বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই রবীন্দ্রোত্তর যুগবাসী, তাঁর শেষ দশ বারো বছরের কাব্যে তিনি স্বয়ংই রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত কেননা প্রায় সপ্ততিবর্ষবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ স্বীয় দীর্ঘ-অনুসৃত সাহিত্যধারায় যে নূতন মোড় দিলেন তার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে কোথায়ও মিলবে বলে মনে হয় না। "মহুয়া"-তে বাংলা প্রেমকাব্যের এক আশ্চর্য নূতন বিকাশ ও পর্যায়। প্রেম এখন সাবয়ব। প্রেমিকা এখন ভাবলোকবাসিনী মানসসুন্দরী নয়, মর্তের স্পর্শসাধ্যা নারী, প্রেমানুভূতি এখন উচ্ছ্বাসের চেয়েও বড়ো, এখন ইন্দ্রিয়াধিগম্য। রবীন্দ্রনাথে প্রেমের কাব্য কত পর্যায়ে বিবর্তিত হল সে-এক চিত্তহারী অনুসন্ধান, সে-অনুসন্ধান এখনো হয়নি কিন্তু আশা করছি অচিরেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের শেষের দিককার কবিতা নবীনতর কবিদের কাছে পথিকৃৎ সর্বতোভাবেই। যে-সাবয়বতা, প্রত্যক্ষতা, বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথের "পূরবী"-পরবর্তী প্রেমকাব্যে পাই, রবীন্দ্রোত্তর প্রেমকাব্যেও সে সব গুণই বর্তমান যদিও প্রত্যেক কবির হাতে গুণগুলি অল্পবিস্তর বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রোত্তর প্রেমকাব্য, আমার বিবেচনায়, মোটামুটি দু'অংশে ভাগ করা যায় সাল-তারিখের ক্রম অনুসারে। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের যাঁরা অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ, যাঁরা অধুনা প্রবীণ ও অল্পবিস্তর লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁরা উত্তরতিরিশের লেখক, উত্তরতিরিশে (অর্থাৎ "পূরবী"-পরবর্তী দশকে) তাঁরা কবিসভায় আসন গ্রহণ করেন। আর যাঁরা এখনো বয়সে ও কবিকর্মে তরুণ, উত্তরচল্লিশে তাঁদের কবিকৃতির সূত্র-পাত। কবি হিসাবে জ্যেষ্ঠতর কবিগণ স্বভাবতঃই বয়ঃকনিষ্ঠদের চেয়ে উৎকৃষ্ট—স্বকীয় শক্তি ছাড়াও দীর্ঘতর আত্মপ্রস্তুতির সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা। জ্যেষ্ঠ কবিদের প্রেমকাব্যের যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটি আসলে তাঁদের সমগ্র কাব্যবৈশিষ্ট্যেই নিহিত,—এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তির প্রয়াস তীক্ষ্ণরূপে আত্মসচেতন। ভাষায়, ছন্দে, রূপকল্প-প্রয়োগে, বাক্‌ভঙ্গীতে ও মনোভঙ্গীতে এঁরা রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তির যে-চেষ্টায় নিরত সে-কঠিন চেষ্টার ক্লেশলক্ষণ এঁদের কাব্যে প্রায়ই লক্ষণীয়, এঁদের প্রথম জীবনের কাব্যে তো বটেই, পরিণত কাব্যেও। এঁদের কয়েকজনা যে অতীব কুশলী ও শক্তিশালী কবি সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই তবুও এক হিসাবে এঁদের জন্ম-তারিখ গেছে এঁদের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথের মতো মহা প্রতিভাবান কবিকে পেয়ে যে-দেশ ধন্য হয়েছে সে-সৌভাগ্যের জন্য সে-দেশকে কিঞ্চিৎ মূল্য দিতে হবে বৈকি! সাহিত্যের ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে যে মহৎ প্রতিভার তিরোধানের পরে আসে ক্লান্তিকাল, সাহিত্যচিন্তা ও প্রকাশভঙ্গীর অস্থিরতা। নবীন কবিদের প্রধান প্রয়াস সর্বাবিস্তারী পূর্বতন অমোঘ প্রতিভার অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া। নবীন কবিদের এ-প্রয়াসের ফলে নবীনতর কবিগণ চলতে পারেন স্বকীয়তার পথে।

যে-ভাবধারা, যে-শিল্পধারা, যে-সাহিত্য প্রকরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে সংযুক্ত, সে-ভাব, সে-শিল্প, সে-প্রকরণ উৎকর্ষের উচ্চতম-সম্ভব স্তরে পৌঁছেছিল রবীন্দ্র-সাহিত্যে, তার মধ্যে আরো উচ্চতা অর্জন করা অন্য কারুর সাধ্য ছিল না। এক হিসাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিল্পের কতকগুলি বিশেষ দিক যেন পৌঁছল নিঃশেষিতপ্রগতিরুদ্ধ পথে। "সম্মুখে রুধিয়া পথ রবীন্দ্র ঠাকুর"। রবীন্দ্রোত্তর নবীন কবিগণ সে-কথা বুঝতে পেরেছিলেন, সে-কথা বুঝতে পেরেই তাঁরা বেরোলেন নূতন পথের সন্ধানে। নবীন কবিদের মধ্যে যাঁরা জ্যেষ্ঠ, আমার মূল্যায়নে, তাঁদের জনককে নিশ্চয় এ-সন্ধানে কৃতকার্য হয়েছেন, তবুও তাঁদের প্রয়াসশ্রম ও কৃতি, তাঁদের শক্তি ও সাফল্য, উভয়ের মধ্যে বহুৎ ব্যবধান রয়ে গেছে। রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তি তাঁরা পেয়েছেন বটে, অন্তত কিয়দংশে, কিন্তু মহৎ সৃষ্টির সহজ আনন্দ তাঁদের কাব্যে প্রায়শ অনুপস্থিত। উপরন্তু মুজিলাভের চেষ্টায় তাঁরা এক কঠিন অন্তঃসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁরা বেড়ে উঠেছেন যে-রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে, যে-রাবীন্দ্রিক আবহাওয়ায় তাঁদের চিন্তা ও শিল্প পরিপুষ্ট, তা থেকে নিজকে অপসারিত করা দুঃসাধ্য ও তীক্ষ্ণরূপে আত্মসচেতন কর্ম তো বটেই, সে-অপসরণের ফলে যে-সাহিত্য সৃষ্ট হয় সে-সাহিত্যে শৈল্পিক সততা ও স্বকীয়তা যে-পরিমাণে প্রশংসনীয়, সৃষ্টির আনন্দ সে-পরিমাণে অনাবিল নয়। রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠীর জ্যেষ্ঠদের মধ্যে প্রেমস্পৃহার চেয়ে কারুস্পৃহা অধিকতর মুখ্য। বুদ্ধদেব বসু ছাড়া আর কেউই স্বভাবত বিশুদ্ধ প্রেমকাব্য বড় একটা লেখেন না। রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তির অস্বচ্ছন্দ প্রয়াসে এই কবিগোষ্ঠীর কাব্য অনেক সময়ই মিশ্রিত বিষয়পরায়ণ। প্রেমকাব্যেও প্রেমের সঙ্গে তাঁরা মিলিয়ে নেন অন্য বিষয়, যথা, আবেষ্টনী-চেতনা, ইতিহাসবোধ, রাজনৈতিক ধারণা। শুদ্ধ অনুভূতি নয়, মননমিশ্রিত অনুভূতি এঁদের শিল্পবিষয়। পরিতাপের বিষয় সে-মনন অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্টই পরানুকারী, স্বায়ত্তবিহীন।

এই নিত্য সচেতন, প্রয়াসপীড়িত কাব্যের সুফল ভোগ করেছেন নবীনতর কবিরা, যাঁরা ১৯৪০-এর পরে কবিতা লিখছেন। এঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য দেখছেন কিঞ্চিৎ দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, এঁদের রবীন্দ্রভক্তি জ্যেষ্ঠদের মতো না আবেগবিহ্বল না শ্লেষবিকৃত, রবীন্দ্রপ্রভাব এঁদের কাছে নাগপাশ নয়, উদ্দীপক পূর্বদৃষ্টান্ত। বাংলা কাব্যের যে-ঐতিহ্য এঁদের কাছে পৌঁছেছে তাতে রবীন্দ্রনাথ শেষ অধ্যায় নন, তাঁর পরেও আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতি। এঁদের কাব্য যে রবীন্দ্রপ্রভাবপীড়িত নয় সেজন্য আশা করি, জ্যেষ্ঠদের কাছে এঁরা কৃতজ্ঞ। কাব্যকরণের সব কৌশল এঁদের জানা নেই, কাব্যের রূপকল্প ও গঠনকারুর জন্য এঁরা প্রায়ই জ্যেষ্ঠদের কাছে ঋণী। কবিকৃতিতে এঁদের অপ্রবীণতা ঘুচবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, কিন্তু যতদিন শিল্পপ্রবীণতা তাঁদের আয়ত্ত না হচ্ছে ততদিন ও, আমার বিবেচনায়, তাঁদের প্রেমকাব্যে (তার যতটুকু নিদর্শন আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত। সিগনেট প্রেস। দাম চার টাকা।

পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা—আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত। সিগনেট প্রেস। দাম চার টাকা।

সমালোচনার উত্তর

এ সংকলনের ("পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা")র) কাব্য-নির্বাচন শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসুর কাছে "সুরুচির পরিচায়ক" এবং "মোটের ওপর প্রশংসনীয়" মনে হয়েছে—এটা সংকলনের সৌভাগ্য, সংকলনকর্তারও। ছ'টি কবিতা সম্পর্কে অবশ্য তিনি আপত্তি জানিয়েছেন। সবচেয়ে "বড় আপত্তি" রবীন্দ্রনাথের 'ভক্ত' নামক কবিতার নির্বাচনে, কারণ এর বিষয়বস্তু প্রেম নয় এবং "প্রেম বলতে জগতের অধিকসংখ্যক মানুষ বুঝেছেন নরনারীর যৌন আকর্ষণ"। বসুমহাশয়ের এই পরিসংখ্যান যদি যথার্থ হয় তাহলে আমি জগতের সংখ্যানুন দলে পড়ি। কিন্তু এ-সম্পর্কে পাঠককে কোন নোটিস দিইনি তাঁর এ অভিযোগ অহেতুক। ভূমিকার দ্বিতীয় অংশে সাত পৃষ্ঠা জুড়ে যা লিখলাম সেটা ঠিক এই জাতীয় নোটিস—এমন কি নোটিসের বাড়াবাড়ি নয় কি? প্রেম বলতে আমি বুঝি উপলব্ধি, আবেগ ও এষনার একটি বিশেষ প্যাটার্ন যার প্রকৃতি আমার প্রবন্ধে বোঝাবার কিছু চেষ্টা করেছি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এবং ঠিকমত যা বোঝান অসম্ভব। এসব বিষয়ে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে অভিজ্ঞতার সমতা না থাকলে বক্তব্য ধোঁয়াটে ঠেকবেই। এই হৃদয়াবেগটি সাধারণত নরনারীর যৌন আকর্ষণ থেকে সঞ্জাত হলেও সেই আকর্ষণের পরিধি ছেড়ে চলে যায় অনেক দূরে। বসুমহাশয় নিজেই তাঁর পূর্বোল্লিখিত স্ট্যাটিস্টিক্যাল সংজ্ঞাটিকে প্রায় উলটে দিয়ে অন্যত্র লিখছেন, "যৌনলিপ্সার কারাগার থেকে মুক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসকেই বলে প্রেম নামক সভ্য চিত্তবৃত্তি"। তিনি মানবেন কিনা জানি না যে এই সভ্য চিত্তবৃত্তির বিকাশ এমন সব ক্ষেত্রেও দেখা যায় যেখানে আদৌ কোন যৌন আকর্ষণ নেই, থাকার হেতুও অবর্তমান। ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুভূতিকে অবিকল নারীর প্রতি পুরুষের কিংবা পুরুষের প্রতি নারীর অনুভূতির রূপকল্পে ভাবা হয়েছে সব দেশেই—আমাদের দেশে বোধ করি সবচেয়ে বেশী। শুধু যে অন্যেরা ভেবেছেন তা নয়, ভক্ত নিজেই ভগবানকে প্রিয়া বা প্রণয়ীরূপে উপলব্ধি করেন, অনুভব করেন। কোনো এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি বিদ্যাপতির 'হরি হে হমর দুখ ক নহি ওর' গীতিকবিতাটিকে ভক্তি-কাব্যের নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলা সাহিত্য বিভাগের একজন কৃতী ছাত্র আপত্তি জানালেন যে ওটি প্রেমের কবিতা, ভক্তির নয়। পাঠক কি নিশ্চয় করে বলতে পারেন কবিতাটি ভক্তিরসের না আদিরসের? শুনেছি রবীন্দ্রনাথ এই গানে সুর দেবার সময় 'কামদারুণ' কথাটাকে পালটে 'বিরহদারুণ' করেছিলেন। আমার বিশ্বাস তাতে এর ভাবৈশ্বর্য খানিকটা খর্ব হল।

শুধু তোমার বাণী নয় হে বন্ধু হে প্রিয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।—

ভক্তিকাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, প্রেমকাব্যেরও,—কারণ ভক্তির ভাববিন্যাসকে এখানে প্রেমের ভাববিন্যাসের ছকে ফেলা হয়েছে। এমন একটি কবিতা আলোচ্য সংকলনে অনায়াসে স্থান পেতে পারত। তবে প্রেম ও ভক্তিরসের এই অত্যন্ত নিকট-আত্মীয়তা অতি পরিচিত বলে বিশেষ করে এই জাতের কবিতা নির্বাচন করতে আমি খুব আগ্রহী হতাম না। প্রকৃতি সম্বন্ধে ঠিক এই ধাঁচের হৃদয়াবেগের প্রকাশ কোনো কবিতায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না, যদিও ওয়াড্‌স্বার্থ, শেলী এবং রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা এর খুব কাছ ঘেঁসে যায়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানে অবশ্য প্রকৃতিপ্রেম মানুষীপ্রেমের রূপ নিয়েছে ('কেন পান্থ এ

চঞ্চলতা'—ইত্যাদি), অনেক গানে প্রকৃতিপ্রেম ও মানুষীপ্রেম একাকার না হয়েও ওতপ্রোত-ভাবে মিশেছে, পরস্পরের পটভূমিকারূপে কাজ করেছে। এইসব গানের তুলনা নেই কোথাও। সাম্প্রতিক সাম্যবাদী কাব্যে দেশপ্রেম ও সমাজপ্রেমের ভাববিন্যাসও নরনারীর প্রেমের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে, অনেক সময়ে ধোঁকা লাগে কবিতাটির উদ্দিষ্ট সমাজ না প্রিয়া। তবে এর চেয়ে সার্থকতর আমার মনে হল সেইসব বামপন্থী কবিতা যেখানে প্রেমানুভূতি অস্বার্থ অথচ সমাজ-বোধের মধ্যে বিধৃত ও তার দ্বারা ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

এ-সবে তবু আমরা অভ্যস্ত হয়ে আসছি। চমক লাগাল প্রভুর প্রতি কুকুরের হৃদয়াবেগকেও এমন সমুজ্জ্বল মানুষীপ্রেমের অনুভূতির ছকে ফেলা যায় দেখে। 'ভক্ত' কবিতাটির নায়ক যে কুকুর সেটা তো প্রথম ছত্রেই বলা আছে। কিন্তু কবিতায় ব্যক্ত অনুভূতির প্যাটার্নটা মানবিক এবং মানুষী প্রেমের। 'ভালোমন্দ সব ভেদ করি দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে'—এ কি ভক্ত কুকুরের মনের কথা না প্রেমিক মানুষের? 'দ্বারে ঢেলে দেওয়া যায় অহেতুক প্রেম, অসীম চৈতন্যালোকে পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা'—একে কুকুরের হৃদয়ানুভূতি বলে ঠাহর করতে হলে কষ্টকল্পনার প্রয়োজন, মানুষের প্রেমের প্রকাশ না ভাবাই শক্ত। নরনারীর প্রেমের যে-রূপকল্প রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল সেটি তিনি কুকুরের চেতনায় আরোপ করেছেন। মনোবৈজ্ঞানিকের পক্ষে তা প্রমাদ, কিন্তু কবির সে অধিকার দেবদত্ত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে তা সত্ত্বেও (অথবা তার জন্যই) কবিতাটি অতীব রসোত্তীর্ণ। এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্যে প্রেমানুভূতির এমন সুন্দর অভিব্যক্তিকে আমি অবহেলা করতে পারিনি।

সোজাসুজি এবং নির্ভেজাল প্রেমের প্রকাশ গত দু'হাজার বছরে এত প্রচুর পরিমাণে এত উৎকৃষ্ট রূপে হয়ে গেছে যে ঠিক সেইরকম প্রকাশ কোনো সমকালীন কবির রচনায় দেখলে আমাদের ঈষৎক্রান্ত সংবেদন-শক্তি সম্পূর্ণ সাড়া দিতে চায় না। যেসব কবিতায় অন্যজাতীয় চেতনার মধ্যে প্রেমের অনুভূতির একটু স্পর্শ বা অনুরণন মাত্র পাওয়া যায়, বা অন্যকথা বলতে গিয়ে প্রেমের কথা যেখানে হঠাৎ এসে পড়েছে, এসেও সমস্ত জায়গা জুড়ে বসতে সাহস পাচ্ছে না, সসংকোচে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে—আমার ব্যক্তিগত রুচিতে তেমন কবিতাই আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতারূপে প্রতিভাত হয়। এমন কয়েকটি কবিতার নির্বাচনে বসু মহাশয় এবং অন্য কোনো কোনো সমালোচক খুশি হননি, কিন্তু আমি তাতে দুঃখিত নই। বরঞ্চ আমার দুঃখ এই যে এই ধরণের কবিতা সংখ্যায় এত কম, পাঠকের রুচিকে খাতির করতে গিয়ে আমি নিজের রুচিকে কতকটা খর্ব করলাম।

বসু মহাশয় যে আমার "ভূমিকাস্বরূপ প্রবন্ধটি"র (ভূমিকার ভূমিকা বললেই ভালো হোত) উপর চোখ বুলিয়েই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন সেটা খুবই স্পষ্ট। এর কারণ নিশ্চয়ই আছে, কারণ বিনা তো আর কার্য হয় না। কিন্তু সেই কারণ অথবা কারণসমষ্টি যে কী তা তাঁর লেখায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ঠিক বোঝা গেল না নিম্নলিখিত সম্ভাব্য কারণ-সমুদয়ের মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি তাঁর মনে অসন্তোষ জাগিয়েছে।

(১) প্রবন্ধের বিষয়টি তাঁর পছন্দ হয়নি।

(২) বিষয়টি ভাল কিন্তু এ বইয়ের ভূমিকারূপে ঐ বিষয়ের অবতারণা অসঙ্গত হয়েছে।

(৩) বিষয়ও ভাল, এখানে তার আলোচনাও চলত, কিন্তু আমি যা লিখেছি সেটা বাজে।

(৪) আমার মতামত বা সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে অগ্রাহ্য ঠেকেছে।

(১) এ নিয়ে কোনো তর্ক চলে না, অথবা বলা উচিত যে বহুদেশকাল জুড়ে এ তর্ক চলে আসছে, আজও তার মীমাংসা হয়নি। এক পক্ষের মত—সাধারণভাবে দার্শনিক গবেষণার এবং বিশেষভাবে কাব্যতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার কোনই মূল্য নেই; বিপক্ষ বলেন (খুব সম্ভব এঁরা সংখ্যালঘু) এসব জিনিষের মূল্য অত্যধিক। বসু মহাশয় যদি প্রথম দলে পড়েন, আমি দ্বিতীয় দলে পড়ি। অতঃপর নমস্কারান্তে আমরা যে যার পথে এগুতে পারি। "নিস্ফলা", "নিঃসিদ্ধান্ত", "অবয়বহীন" বিশেষণগুলি তিনি সাধারণভাবে কাব্যজিজ্ঞাসা সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছেন, নাকি বিশেষ করে আমারই রচনার উদ্দেশ্য—সেটা অস্বার্থসূচক ভাষায় বলা হয়নি। খুব সম্ভব দ্বিতীয়টাই। প্রথমটা হলে তার সপক্ষে কোনো যুক্তি পেলাম না তাঁর সুদীর্ঘ সমালোচনায়।

(২) কাব্যস্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা না করে "বাংলায় প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য, কাব্যে প্রতিফলিত বাঙালীর প্রেমের বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রতিক কাব্যে প্রেমের শিল্পরূপ, এ ধরণের কয়েকটি বিষয়ে" আমি মনোনিবেশ করিনি বলে বসু মহাশয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সমালোচ্য পুস্তকের ভূমিকাতে ঐ সব বিষয়ের একটি সুযোগ্য আলোচনা থাকলে যে ভালো হত সে কথা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু তেমন লেখা লিখতে তো আমি অধিকারী নই। পরধর্ম ভয়াবহ জেনেই সে চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলাম। "খাঁটি সাহিত্যিক আলোচনা" আমার ক্ষমতার অতীত এবং চিত্তধর্মের প্রায় বিপরীত। আমার চোখের সামনে *Oxford Book of Christian Verse*-এর ভূমিকার সদৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন বসুমহাশয়, কিন্তু বৃথাই। ইংরাজি প্রবাদবাক্যে মাঝ দরিয়ায় ঘোড়া বদল করতে নিষেধ আছে; মাঝ বয়সে পৌঁছে পূর্বসাধনায় স্থির থাকাই ভাল। যৌবনকালে মানুষ ভাবে সে সব্যসাচী। প্রৌঢ় বয়সের আশাভঙ্গ তাকে জানিয়ে দেয় কোনো একটি বিষয়ে সামান্য একটু সিদ্ধিও কত দুর্লভ। বসুমহাশয় স্বয়ং কণ্ঠ করে আস্ত একটি বিকল্প ভূমিকাই লিখে দিয়েছেন। আমি যা লিখতে পারতাম না তিনি তা লিখে দিয়ে ভালই করেছেন; এসব ব্যাপারে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা তার গুণাগুণ বিচার করবেন, এবং ভাবী সংকলনের প্রকাশকরা সেদিকে মনোযোগী হবেন। কিন্তু এ জাতীয় লেখায় পাণ্ডিত্য-প্রকাশের সুযোগ নেই অথবা কম, তাঁর এই উক্তিটা মানতে পারলাম না। সুযোগ বরঞ্চ বেশি। এর যথেষ্ট প্রমাণ বসুমহাশয় নিজেই দিয়েছেন (দেশীবিদেশী, বিদেশীই অধিক, প্রায় তিরিশটি নামের উল্লেখ আছে তাঁর সমালোচনার এই অংশে)। আরো প্রমাণ দিতে চাইলে বিষয়ের দিক থেকে কোনো বাধা পেতেন না। সমালোচক লিখছেন, "ক্ষোভের বিষয়, কেননা বর্তমান সম্পাদনাকার্যে এমন কোনো প্রমাণ পেলাম না যাতে বলতে পারি যে-পরিমাণে সম্পাদকের রুচি প্রশংসনীয় তাঁর সমালোচনা-কুশলতা সেই পরিমাণে আদরণীয়"। শূন্য থেকে কোনো কিছুর প্রমাণ পাওয়া দুঃসাধ্য বটে। আমার "সম্পাদকীয় রচনায়" কাব্যজিজ্ঞাসা আছে, কাব্যসমালোচনা একেবারে অনুপস্থিত। সেই অনুপস্থিত সমালোচনার কুশলতা বসুমহাশয়ের কাছে আদরণীয় ঠেকেনি এটা খুব আশ্চর্য নয়।

কাব্যসমালোচনায় যদি আমি অপারগ কাজেই পরাঙ্মুখ হই তবে কোনো ভূমিকা না

লিখলেই তো হত। আমারও ইচ্ছা তাই ছিল, কিন্তু প্রকাশক মহাশয় কিছুতেই মানলেন না। বললেন আমার কাছ থেকে একটি ভূমিকা তাঁর চাই-ই, সাহিত্যিক না হয়ে দার্শনিক হলেও আপত্তি নেই। আমার তরফে যা বলার আছে তা দুটি প্রশ্নের আকারেই বলি। প্রেমের কবিতা যাঁরা পড়েন, প্রেম ও কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই কি তাঁদের মনে কখনও জাগে না? ঐ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনায় যোগ দেওয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য হতে পারে, কিন্তু সেরকম আলোচনা একেবারে অপাঙক্তেয় হবে কি? আর একটি কথা। কবিতার সাহিত্যিক বিচার ভালো মন্দ মাঝারি অনেকে অনেক রকম করছেন; তার স্বরূপজিজ্ঞাসা, আর কিছু না হোক, বিরল তো বটেই। বাংলা প্রবন্ধে সর্বত্র ইতিহাসের ছড়াছড়ি দেখে আমি বড় হতাশ বোধ করি। দুএক শতাব্দী বা সহস্রাব্দী পেছনে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আর কতকাল পথ চলব আমরা?

(৩) সাধারণ ভাবে যদি বসুমহাশয় বলেন যে আমার লেখ্যটি নিকৃষ্ট হয়েছে, তবে তাঁর সে তিরস্কার আমি নীরবে মেনে নেব। বিশেষভাবে তিনি কয়েকটি দোষ এবং "দুর্বলসূত্র" দেখিয়েছেন; তার উত্তরে আমার বক্তব্য জানাচ্ছি।

বসুমহাশয় বলেছেন আমার এ লেখার কোনো কোনো অংশে অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ ঘটেছে। ঠিক কোন্ অংশগুলি তাঁর মতে অপ্রাসঙ্গিক তা তিনি জানাননি। জানালে আমি দেখাতে চেষ্টা করতাম ঐ অংশগুলি কোন্ সূত্রে অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত, সমগ্র প্রবন্ধে তাদের স্থান ও প্রয়োজন কোথায়। প্র্যাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্, পজিটিভিজ্‌ম্ প্রভৃতির অবতারণায় তাঁর আপত্তি আছে বোঝা গেল, কিন্তু ঐসব বিষয়ে আমি কোনো আলোচনাই করিনি। উল্লেখমাত্র করেছিলাম চল্‌তি মতের হাওয়া কোন্ দিকে বইছে সেইটা শুধু নির্দেশ করবার জন্যে। এই হাওয়ার প্রতিকূলে কিছু বলা আবশ্যক ছিল, কারণ কাব্যবিষয়ে আমার বক্তব্য ঐ হাওয়াতে টিকতে পারে না।

বসুমহাশয়ের আর একটি অভিযোগ এই যে এ-প্রবন্ধে উল্লিখিত নাম ও উদ্ধৃত বাক্যের বাহুল্য দেখা যায়। কিছু বাহুল্য সত্যিই ঘটেছে—নিছক আলস্যের ফলে। সেটা দোষের। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার জন্য দায়ী দার্শনিক বিচারের একটি সাধারণ অসুবিধা এবং সেই সঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অক্ষমতা। আমার বক্তব্য যদি খুবই অভিনব হত, অন্তত আহরিত অংশের পরিমাণ অত্যল্প থাকত—অর্থাৎ আমি যদি একজন দার্শনিক প্রতিভা হতাম (কোনো শতাব্দীতেই তাঁদের সংখ্যা দুচার জনের বেশী নয়) তাহলে অন্যসব মতকে অগ্রাহ্য করে আমি সোজাসুজি নিজের মতটাই ব্যক্ত করে যেতাম। কিন্তু এপথে আমি একজন সামান্য পদাতিক, কোনো অর্থে মহারথী নই। আমার মতের অধিকাংশ খণ্ড-অংশ অন্যের কাছ থেকে পাওয়া, কেবল সমগ্রের বিন্যাসটাই আমার স্বকীয়। তাই প্রত্যেকের কাছে না হোক অন্তত প্রধান উত্তমর্ণ যাঁরা তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করবার নৈতিক দায়িত্ব আমার আছে, এবং যাঁদের আমি খুব নিকটবর্তী তাঁদের সঙ্গে আমার মতের যেটুকু প্রভেদ সেটা নির্দেশ করবার স্বাভাবিক প্রয়োজন। তাছাড়া দার্শনিক কোনো বিচারই সরাসরি সিদ্ধ বা পুরোপুরি অসিদ্ধ নয়; সবটাই কিছু সত্য কিছু ভ্রান্তি, কিছু যুক্তি কিছু খেয়ালের মিশোল পাওয়া যায়। মাত্রাভেদ অবশ্য আছে। এবং একজন দার্শনিক কোন্ মতটিকে বরণ বা গঠন করবেন সেটা শেষ পর্যন্ত অনেকাংশে নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের উপর, তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গীর উপর। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার মনে হয় দার্শনিক বিচার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং শিল্পসৃষ্টির মধ্যবর্তী। তাই কোনো দার্শনিকের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী মতামতের কতটুকু

গ্রাহ্য এবং কতটুকু খণ্ডনীয় ও বর্জনীয় তার নির্দেশ দার্শনিক বিচার-পদ্ধতিরই অঙ্গীভূত। চূড়ান্ত প্রমাণ যেখানে মরীচিকা, সেখানে তুলনামূলক বিচার এবং বিতর্কই পথ। কাজেই বহু নাম ও মতের উল্লেখ অনিবার্য। ছিদ্রান্বেষী বলতে পারেন এটা পাণ্ডিত্য-প্রকাশ; জ্ঞানান্বেষী তার অন্যবিধ প্রয়োজন অনুভব করবেন।

রইল উদ্ধৃতি। বসুমহাশয় বলেছেন যে যে-সব কথা আমি নিজের দায়িত্বে বল্‌তে পারতাম কিন্তু বলতে সাহসী হইনি সেসবের জন্য পরের সমর্থন ভিক্ষে করেছি। উক্তিটা অকরুণ, কিন্তু তাতে আপত্তি নেই। আপত্তি এই যে এখানেও তাঁর উক্তিতে যাথার্থ্যের অভাব ঘটেছে। আমার অধিকাংশ উদ্ধৃতি সাহিত্যের সেইসব দুলাল বাক্যের যার সমর্থন অন্যেরা খোঁজেন কিন্তু আমি যেগুলিকে খণ্ডন, সংশোধন বা চলতি অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। মালার্মে, এলিয়ট, ওয়ার্ড্‌স্‌বার্থ, অভিনব গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, মার্ক্‌স্, হেগেল, পার্কার, ড্রাইডেন এই পর্যায়ভুক্ত। কয়েকটি উদ্ধৃতি আছে এমন সব বাক্যের যার দ্বারা ভিন্ন মতাবলম্বী পূর্বাচার্যরা নিজের বিঘোষিত মত নিজেই খণ্ডন করেছেন—যথা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের জবানীতে অভিনবগুপ্ত, ক্রাইভ্ বেল, এ, সি, ব্র্যাড্‌লী, ক্রোচে। এসব বাদ দিলে মাত্র চারপাঁচটি উদ্ধৃতি থেকে যায় যা আমার স্বপক্ষের—তার মধ্যে দুটি পদ্য। এই উদ্ধৃতিগুলি সুন্দর এবং লাগসই বলেই আমার পক্ষে লোভনীয় হয়েছিল, নইলে আমার বক্তব্যের **সমর্থনে** তাদের টেনে আনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বাদ দিলেও সে বক্তব্য মোটেই দুর্বল হয় না।

বসুমহাশয় প্রবন্ধের মধ্যে "অনেকগুলি দুর্বলসূত্র" খুঁজে পেয়েছেন। সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

(ক) "প্রাচীন গ্রীকদের অনুকারবাদ পরবর্তী গ্রীক দার্শনিকরাই মেনে নিতে পারেননি"—আমার এই উক্তিতে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আপত্তি আছে। তিনি বলছেন যে এ্যারিস্টট্‌ল্-পরবর্তীরা "অনুকরণবাদ অস্বীকার করেননি, অনুকরণবাদের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়েছেন।" আমি তো বলিনি যে পরবর্তীরা অনুকারবাদ ("অনুকরণবাদ") অস্বীকার করেছিলেন, আমি লিখেছিলাম তাঁরা "**প্রাচীন গ্রীকদের** অনুকারবাদ মানতে পারেননি।" এই বড় অক্ষরের বিশেষণ পদটিকে বিলুপ্ত করে দিয়ে বসুমহাশয় অনর্থক ছায়ার সঙ্গে ঝগড়া করতে উদ্যত হয়েছেন। প্রাচীন গ্রীক অনুকারবাদ বলতে আমি কী বুঝি, "প্রকৃতির নিখুঁত প্রতিকৃতি," "প্রতিবিম্বকে বিম্বের অবিকল অনুবর্তী করা," প্রভৃতি বাক্যাংশের মধ্যে কি সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়নি? বসুমহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে ঠিক এই ধরণের অনুকারবাদ স্বয়ং এ্যারিস্টট্‌ল্ মানেননি; আরো পরবর্তীরা তো এর থেকে আরো দূরে সরে গিয়েছিলেন। প্লটাইনাসের লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত নই, তাঁর সম্বন্ধে ক্রোচের মন্তব্য উদ্ধৃত করছি : 'The mystical view, which considers art as a special mode of self-beatification, of entering into relation with the Absolute, with the Summum Bonum, with the ultimate root of things, appeared only in late antiquity, almost at the entrance to the Middle Ages. Its representative is the founder of the neo-Platonic school, Plotinus." (*Aesthetic*, p. 162) । এটা কোনো অর্থে প্রত্যক্ষ-বস্তুর অনুকরণমূলক শিল্পব্যাখ্যা নয়। 'অনুকারবাদ' সংজ্ঞাটি অবশ্য বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল—বলতে গেলে সংজ্ঞতের খোল-নলচে দুই-ই পালটে দিয়ে। ইতিহাস থেকে

কাব্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে এ্যারিস্টট্‌ল্‌ বলেছিলেন, ইতিহাসের কারবার 'বিশেষ' অর্থাৎ particular-কে নিয়ে, কাব্যের আধেয় 'সামান্য' (universal)। কিন্তু বিজ্ঞানের অভিপ্রেতও সেই 'সামান্য'ই; তবে দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? এ্যারিস্টট্‌ল্‌ এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। অনুকারবাদকে বিশেষ বস্তু থেকে সামান্য ভাবের (idea) দিকে নিয়ে গিয়ে এ্যারিস্টট্‌ল্‌ দুটি ভুল করলেন। প্রথমত, সামান্যের অনুকরণ বলতে স্পষ্ট কিছু বোঝায় না; দ্বিতীয়ত, কোনো সোজা অর্থে 'সামান্য' কাব্যের বিষয় নয়, যেমন কিনা তা বিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু এইসব তর্ক তুলে পরিস্থিতি আবার জটিল করে ফেলতে চাই না।

(খ) মার্ক্‌স্‌ এঙ্গেল্‌সের ভাষায় মানবচিত্তকে জড়জগতের মুকুর-বিম্ব বলা সোহং-বাদের উল্টোপিঠ এবং ভ্রান্তিবিলাসে দুইই তুলামূল্য—আমার এই উক্তিতে বসুমহাশয় বিষম চটেছেন। তিনি যদি মার্ক্‌স্‌বাদের প্রত্যেকটি সূত্রকে বেদবাক্য জ্ঞান করেন কিংবা সলিপ্‌সিস্ট মতাবলম্বী হন তবে চটবার কারণ তাঁর আছে। কিন্তু পৃথিবীর কোনো মতবাদের কোন একটি খণ্ডাংশকে ভ্রান্ত বলার আগে সেই মতবাদ সম্বন্ধে বক্তা কতখানি বিদ্যা অর্জন করেছেন দলিল-দস্তাবেজ সহ তার প্রমাণ বসুমহাশয়ের নিকট উপস্থাপিত করতে হবে—এ দাবীটা বাড়াবাড়ি। একটু ধৈর্যের সঙ্গে প্রবন্ধ পাঠ করলে বসুমহাশয় লক্ষ্য করতেন যে কয়েক পৃষ্ঠা পরেই আমি মার্ক্‌স্‌বাদের একটি মূল প্রত্যয়ের (বিশ্বজগতের ডায়লেক্‌টিক্‌ বিকাশের) প্রতি সবিস্তারে আমার আন্তরিক আস্থা জ্ঞাপন করেছি। এখানে অবশ্য আমার একটি ত্রুটি স্বীকার করা কর্তব্য। 'সোহংবাদ' শব্দটা যে আমি solipsism-এর বাংলা পারিভাষিক প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করেছিলাম (আমার উদ্ভাবনা নয়, শব্দটি কোনো পূর্বসূরীর লেখা থেকে সংগৃহীত—খুব সম্ভব সুধীন্দ্রনাথ দত্তের), এটা সুস্পষ্ট-রূপে পাঠককে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল বিশেষ করে এইজন্য যে সোহংবাদের আর একটি প্রচলিত অর্থ বেদান্ত। এবং বেদান্তের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই, বেদান্ত সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। শুনেছি বৈদান্তিক অনেকগুলি মতের মধ্যে একটি মত দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ নামে পরিচিত, এবং সেটি সলিপ্‌সিজমের খুবই কাছাকাছি। কিন্তু অন্য কোনো বৈদান্তিক মতকে বা এই মতের solipsist epistemology ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গকে আমার বক্তব্য স্পর্শ করে না।

(গ) "অবশ্য ও হয়তো-র মধ্যে মর্মান্তিক গোলযোগ" বাধে যদি 'অবশ্য' শব্দটি 'নিশ্চয়ই' অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাংলায় ও দুটি শব্দ সর্বদা সমার্থবাচক নয়। 'অবশ্য' অনেক ক্ষেত্রে বাক্যটির উপর একটু জোর দিয়েই আপন কর্তব্য সমাধা করে, বিবক্ষিত ব্যাপারের সম্ভাব্যতার মাত্রা ষোল আনা কি তার চেয়ে অনেক কম সেটা নির্দেশ করবার দায়িত্ব নেয় না। ইংরেজিতে certainly আর of course-এর পার্থক্য এর সঙ্গে তুলনীয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক : 'আমাদের দলের অনেকেই সভায় উপস্থিত থাকবেন, অবশ্য আমি ঠিক সময়ে হয়ত পৌঁছুতে পারব না।' অবশ্য-এর প্রয়োগ কি এখানে ব্যবহার-সিদ্ধ নয়? আমি জোর করে কিছু বলতে চাই না, কিন্তু প্রশ্নটা ইডিয়মের, লজিকের নয়।

মনিজম্‌-ও যে মেটাফিজিক্সের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে তাতে আর সন্দেহ কি, বি. এ. ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকই তার প্রমাণ। কিন্তু স্কলারলিস্টরা বরাবরই বলে এসেছেন যে মনিজম্‌-এর মূল কথাটা যুক্তি-নির্ভর নয়, যোগজ প্রত্যক্ষের ব্যাপার, মিস্টিক্যাল। জেম্‌স্‌ এক জায়গায় লিখেছেন : 'To interpret absolute monism worthily, be a mystic'. রাসেলের অভিমতও তাই ('Mysticism and Logic' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। এবিষয়ে আমি

মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করেছি মাত্র, কোনো মৌলিক মূর্খতার পরিচয় দিইনি।

বসুমহাশয় বলেছেন, এসব তর্ক বাদ দিয়েও আমার যে-উক্তিটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন তার বক্তব্যে খুব একটা যুক্তিবিরোধ আছে। কোথায়? কাব্যের সত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্যকে আমরা মেলাতে পারি না। যোগী যদি বলেন যে তিনি পারেন তবে তাঁর কথা যথার্থ হতেও পারে, কিন্তু তাঁর সেই অদ্বৈত মহাসত্যটি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিগম্য। সুতরাং আমরা তা মানব কেন? আমাদের অভিজ্ঞতার সীমানায় অনেকান্ত সত্যগুলিই স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরম, 'তাহার উপরে নাই'।—এর মধ্যে যুক্তিবিরোধ আবিষ্কার করা 'বিস্ময়ের বিষয়' বটেই।

(ঘ) আর্টের সুখবাদী ব্যাখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত নিদর্শন হিসেবেই ড্রাইডেনের উক্তিটি ব্যবহার করেছিলাম, এই ব্যাখ্যার ইতিহাসে ড্রাইডেনের স্থান নির্দেশ করা আমার অনভিপ্রেত এবং আমার রচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক ছিল। স্মরণশক্তি ক্ষীণ বলে ইতিহাস নামক বস্তুটাকে আমি বড় ডরাই। তবু এটুকু জানি যে উক্ত মত গ্রীক আমলেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু আসল কথায় আসা যাক। শিল্পের সুখবাদী ব্যাখ্যা-কর্তাদের পক্ষে 'স্বভাবতঃই একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কিং লীয়র, শ্যামা প্রভৃতি ট্রাজেডির মূল্যায়ন'—আমার এই মন্তব্য পড়ে বসুমহাশয় এমন "আশ্চর্য আশ্চর্য" হয়ে উঠলেন কেন? পৃথিবীতে এত বিচিত্র বস্তু থাকতে একজন সামান্য লেখকের একটি নিরীহ উক্তিতে এতখানি বিস্ময়বোধ খরচ করে ফেলা ভালো নয়। শব্দপ্রয়োগ ব্যাপারে বসুমহাশয় আবার তাঁর অভ্যস্ত অনবধানতা এবং precision-এর অভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সুখবাদী ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি একটি মন্তব্য করলাম, বসু-মহাশয় প্রচণ্ড আপত্তি তুলে বললেন যে আনন্দবাদী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সে মন্তব্য খাটে না! এখানে 'সুখে'র জায়গায় 'আনন্দ' শব্দটা বসিয়ে দিলে যে মূল উক্তি একেবারে অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। সাদাসিধে অর্থে সুখ জাগানই আর্টের উদ্দেশ্য—এমন কথা বললে ট্রাজেডির কোনো সৎ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। অধিক মাত্রায় সুখ, অবিমিশ্র সুখ, স্থায়ী সুখ ইত্যাদি বললেও সম্ভব হয় না। অগত্যা 'সুখ' কথাটা সম্পূর্ণ বর্জন করে রসানন্দ, হ্লাদ প্রভৃতি ভিন্নার্থ বাচক শব্দ, কাজেই ভিন্ন পর্যায়ের অনুভূতির মধ্যে আর্টের তাৎপর্য খুঁজতে হয়। রসের অনুভূতি যেমন সাধারণ সুখদুঃখের ভাবগ্রামের বাইরে পড়ে, প্রেমের অনুভূতিও তেমনি। এই তো ছিল আমার মোটা বক্তব্য। এতে পরম বিস্ময়েরই বা কি দেখলেন বসুমহাশয়, এবং "ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাস"ই বা কোথায় পেলেন?

(ঙ) এক জায়গায় বসুমহাশয় বলছেন আমার এই প্রবন্ধ "নিঃসিদ্ধান্ত", অন্যত্র লিখছেন যে এতে "কাব্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু সুষ্ঠু আলোচনা আছে সেটুকু আইয়ুব মহাশয়ের পূর্বতন সংকলনের ভূমিকাতেও পাওয়া যায়।" হয়ত সময়াভাবে দুটোর কোনো প্রবন্ধই তিনি আগাগোড়া পড়েননি, খুব সম্ভব কোনোটার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক বোধ করেননি। নইলে ওরকম দুটি অযথার্থ মন্তব্য তিনি করতেন না। আগের সংকলনের ভূমিকার প্রথম অংশে (যেখানে কাব্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে) আমি কবিতার সংজ্ঞা, সংকাব্যের প্রতিমানাদি বিষয়ে তিনটি প্রতিভূ মতের উল্লেখ করেছিলাম—শুধু এইটুকু দেখাবার জন্য যে এ-ব্যাপারে কত গভীর মতানৈক্য বিদ্যমান, এবং কোনো ঐকমত্যে পৌঁছবার সম্ভাবনা কত সুদূর-পরাহত। অথচ "কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অংশতঃ কোনো মতৈক্যই না ঘটলে কবিতার ভালোমন্দ যাচাই করা নিতান্ত ব্যক্তিগত খামখেয়াল, তাতে সর্বসম্মতির দাবী হয় মূঢ়তা নয় অহংকার" ("আধুনিক বাংলা কবিতা", পৃ ৷৷০)। বর্তমান সংকলনের ভূমিকাতে

আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি খুব প্রাথমিক এবং সাদামাটা মত (প্রাচীন গ্রীকদের অনুকারবাদ) থেকে আরম্ভ করে ডায়লেকটিকের ঘোরা সিঁড়ি বেয়ে এমন মতে উপনীত হয়েছি যাকে আমি নিজে সমর্থন করতে পারি। সে মতটাই এ প্রবন্ধের প্রথম অংশের সিদ্ধান্ত। সেটার অস্তিত্বমাত্র যখন বসুমহাশয়ের চোখে পড়েনি তখন সংক্ষেপে তার পুনরুল্লেখ এখানে অমার্জনীয় হবে না আশা করি—যদিও আমার মূল প্রবন্ধটাই যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত, এবং তার স্বল্প পরিসরের মধ্যে অনেকগুলি কথা সন্নিবিষ্ট করবার চেষ্টার ফলেই প্রসাদগুণবর্জিত হয়েছে।

কাব্য বহির্জগতের অনুকরণ না হলেও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটি অখণ্ড বোধের মধ্যে গ্রহণ ক'রে যে মূল্যবোধের দ্বারা অভিষিক্ত হয় কবিচিত্ত, কবিতার মূল্য সেই পরম-মূল্যেরই প্রতিচ্ছায়া। গ্রীকদের সম্পূর্ণ বিষয়গত মিমেটিক্ মতবাদের এ্যাণ্টিথিসিসরূপে উল্লেখ করেছিলাম একটি বিষয়ীগত মতবাদের—আধুনিক কালের প্রসাদ-লালিত (যদিও আমাদের দেশের পক্ষে প্রাচীন) এক্সপ্রেশানিস্ট্ থিয়োরীর। উক্ত দুই মতের সংশ্লিতরূপে যে তৃতীয় মতটি আপনি দানা বাঁধে তার মূল কথা হল এই যে কাব্য বহির্জগতের প্রতিবিম্ব বটে, কিন্তু তার উপরিতলবর্তী দিনানুদৈনিক খণ্ডরূপের নয়; তার গভীরতর ও সমগ্রতর রূপই কবিচিত্তে উপলব্ধ হয়ে তাঁর কাব্যে অভিব্যক্ত হয়। আবার এও সত্যি যে কাব্য কবির অন্তরের প্রকাশ, কিন্তু সে অন্তর্চেতনা শূন্যে দোদুল্যমান, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ কিছু নয়। বস্তুকে নিয়েই চেতনা। তবে বস্তু ও চেতনা একেবারে অসম্পৃক্তও হতে পারে না, একেবারে অভিন্নও নয়। বিজ্ঞান চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব বস্তুসত্তাকে আমাদের ভাবনা-বেদনা থেকে পৃথক করে স্বাধীন করে দেখতে; কবির মন চায় বাইরের জগতের সঙ্গে নিবিড় সাহিত্য। এই দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্ক কাব্যানুভূতির বৈশিষ্ট্য, প্রেমেরও। প্রেমিকের উপলব্ধিতে তার প্রেমাস্পদের স্বরূপও তেমনি—সত্য কিন্তু সার্বজনীন নয়, বিষয়গত অথচ বিষয়ীর অনুভবসাপেক্ষ। এটাই প্রবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে যোগসূত্র। আগের প্রবন্ধে আমি যে কাজটা সযত্নে এড়িয়ে গেছি, এখানে (বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অংশে) সেই দুরূহ কাজে প্রবৃত্তবান হয়েছি—অর্থাৎ কাব্যের মূল্য সম্বন্ধে একটি মত দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি। এই বিষয়ে আমার কোনো সিদ্ধান্ত নেই না বলে, আমার সিদ্ধান্তটি বসুমহাশয় গ্রহণ করেননি বললেই তাঁর উক্তি যথার্থ হত। কিন্তু তা'হলে আমার যুক্তি ও উক্তির বিরুদ্ধে (এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণতঃ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়, কতক পরিমাণে তা পাঠকের সমদৃষ্টি ও সমানুভূতি উদ্রেকের উপর নির্ভরশীল) তাঁর কী বলবার আছে, কাব্যজিজ্ঞাসায় কোন্ বিকল্প সিদ্ধান্তটি তাঁর মতে গ্রাহ্য—সে-সব কথা জানাবার দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারতেন না।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

পুনঃ :

সম্প্রতি শ্রীমান সুরজিৎ দাশগুপ্তের সমালোচনায় (উত্তরসূরী, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৩) একই রকম ভুল দেখে আশ্চর্য হলাম। তিনিও ধরে নিয়েছেন যে আমি যতগুলি মতের উল্লেখ করেছি সব আমারই মত, এবং যতগুলি উদ্ধৃতি দিয়েছি সব আমারই বক্তব্যের

সমর্থনে। অতঃপর তিনি ঐগুলির মধ্যে পরস্পর-বিরোধ, কিংবা উল্লিখিত মত বা উদ্ধৃত বাক্যের সঙ্গে আমার বক্তব্যের বিরোধ আবিষ্কার করে খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। শিল্পে কোনো গূঢ় অর্থের ইঙ্গিত নেই, তার রূপ রেখা ও ধ্বনির মাধুর্যেই তার মূল্য—এমন শিল্প ব্যাখ্যাকে আমি বলেছিলাম কাব্যবিচারে দেহাত্মবাদ। এই মতটি স্পষ্টতঃই আমার নয়, এবং ডেকরেটিব আর্ট্ ছাড়া অন্য কোনো আর্টের বেলায় খাটে না। উচ্চাঙ্গের শিল্প-রচনার আঙ্গিক আমার মতে (এবং আরো অনেকের মতে) "অর্থব্যঞ্জনাঘন"। সেই অর্থ-জিজ্ঞাসায় তারপর আমি এগিয়েছি। শ্রীমান দাশগুপ্তের মত কাব্যপাঠকের পক্ষে এইটুকু বোঝা সম্ভব হয়নি কেন?

ওয়ার্ডস্বার্থের উদ্ধৃত বাক্যে (poetry is emotion recollected in tranquillity) আমি দুটি ভুল দেখিয়েছিলাম। প্রথমতঃ কাব্যে যা ব্যক্ত হয় তা recollected কিছু নয়, "একান্তই উপস্থিত"। দ্বিতীয়ত, "প্রাত্যহিক জীবনের হৃদয়াবেগের পর্যায়ে তাকে ফেলা যায় না," তা মনের অন্য কক্ষের ব্যাপার, নৈর্ব্যক্তিক, সাধারণীকৃত, ইত্যাদি। এই শেষের কথাগুলির প্যারাফ্রেজ করে সুরজিৎ লিখছেন "তা যদি হোল তা'হলে কাব্যকে emotion recollected in tranquillity বলা যায় কেমন করে।" শ্রীমানের পক্ষে কেমন করে ভুলে যাওয়া সম্ভব হোল যে :—(১) উক্তিটি আমার নয় ওয়ার্ডস্বার্থের; এবং (২) তিনি আমার বিরুদ্ধে যে আপত্তি তুলেছেন, ওয়ার্ডস্বার্থের বিরুদ্ধে আমার আপত্তির একাংশ অবিকল তাই।

সুরজিৎ ঠিকই বুঝেছেন যে "প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে সম্পাদকের ধারণা স্বচ্ছ নয়।" প্রেম সম্বন্ধেও না, কবিতা সম্বন্ধেও না। আশা করেছিলাম তিনি আরো বুঝবেন যে ঐসব বিষয়ে ধারণা স্বচ্ছ করতে আমার আগ্রহ আন্তরিক, এবং সাধনা শ্রমবিমুখ নয়। সিদ্ধি অবশ্য এখনও সুদূর। প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে কাদের ধারণা যে স্বচ্ছ তা আমি জানি না, আমার সমালোচকদের যে নেই সেটুকু বলতে পারি। পূর্বোক্ত দু'জন সমালোচকের কথাই ধরা যাক—এঁদের সমালোচনা নিয়েই কথা হচ্ছে যখন। দেখছি রবীন্দ্রনাথের "ভক্ত" কবিতা বিষয়ে এঁরা একমত : সেটা প্রেমের কবিতা নয়। এই কবিতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পূর্বে জানিয়েছি। বসুমহাশয়ের মতে বিষ্ণু দের 'আলেখ্য' প্রেমের কবিতা নয়, কিন্তু তাঁর 'ঘোড়সওয়ার' প্রেমের কবিতা। দাশগুপ্ত মহাশয়ের মত ঠিক উল্টো। বসু মহাশয়ের মতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নির্বাচিত সব কবিতাই প্রেমের কবিতা; দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে তাঁর "নান্দীমুখ" প্রেমের কবিতা নয়। তিনি কি ঠিক জানেন যে ঐ কবির "শর্বরী" তাঁর স্বকীয় সংজ্ঞা-অনুযায়ী প্রেমের কবিতাই, "প্রেম তত্ত্ব নিয়ে রচিত" নয়? এই সমালোচকের মতে বুদ্ধদেব বসুর "কবিমশাই"-ও প্রেমের কবিতা নয়; বসু মহাশয়ের ঐ কবিতাকে প্রেমের কবিতা বলতে কোনো আপত্তি নেই। জীবনানন্দ দাশের "ধান কাটা হয়ে গেছে"-কে দুজনই বাদ দিতে চান, কিন্তু ভিন্ন কারণে। বসু মহাশয়ের মতে কবিতাটি ভালই, কিন্তু প্রেমের কবিতা নয়; দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে কবিতাটি বাজে, তাতে কবির সুনাম বিপন্ন হয়।

রুচিভেদ স্বাভাবিক, পররুচি-সহিষ্ণুতা বিরল, কিন্তু একেবারে তথ্যাতথ্য-জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মত অধৈর্য বিস্ময়কর। কিরণশংকর সেনগুপ্তের কোনো কবিতা নির্বাচিত হয়নি বলে শ্রীমান সুরজিৎ দাশগুপ্ত উষ্মা প্রকাশ করেছেন, অথচ সংকলনের সূচিপত্রে এই কবির নাম আছে, ১৬৩-১৬৪ পৃষ্ঠায় তাঁর কবিতা রয়েছে। অজিত দত্তের "**আর সব**

রচনা বাদ দিয়ে 'নষ্টচাঁদ' নেওয়া হয়েছে"—এই উক্তিও তথ্যের ধার ধারে না, কারণ অজিত দত্তের আরও দুটি কবিতা এই সংকলনে বর্তমান।

কবিতা সরল ও নির্ভার হবে, 'সর্বত্রগামী' হবে; এবং গদ্যেই থাকবে নানা দুরূহ জটিল ও জ্ঞানগুরু বিষয়ের আলোচনা, বিষয়-অনুযায়ী অধিকারভেদ কতক পরিমাণে মেনে নেবে গদ্য—এটাই স্বাভাবিক নয় কি? কিন্তু এ এক অদ্ভুত যুগে আমরা বাস করছি যখন কবিরা দাবী করেন (এবং সে দাবী সমালোচকরা সোৎসাহে সমর্থন করেন) যে প্রত্যেকটি কবিতা পাঁচবার করে পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটি ছত্রের শেষে পাঁচ মিনিট ধরে ভাবতে হবে, নইলে কবিতা হবে হেঁয়ালি; তীক্ষ্ণ ও সজাগ বুদ্ধি এবং প্রভূত জ্ঞানভাণ্ডার না থাকলে কবিতা-পাঠে অধিকার জন্মাবে না কারো। অথচ গদ্যে পৃথিবীর গভীরতম সমস্যার আলোচনা করতে গেলেও সে গদ্য চোখ বুলিয়েই বুঝে ফেলা যাবে, পাঠকপক্ষে বিন্দুমাত্র শ্রবণ-মনন না থাকলেও যদি কোনো পাঠক কোথাও কিছু বুঝতে এতটুকু অসুবিধা বোধ করেন তবে যত দোষ সব প্রবন্ধকারের। কবির কোনো প্রসাদগুণে থাকা অনাবশ্যক, পাঠক-কেই নিজগুণে বা বিশ্বকোষ ঘেঁটে কবিতার মর্মোদ্ঘাটন করতে হবে। মনে হয় এঁরা যেন ধরেই নিচ্ছেন যে পদ্যরচনা পড়বার বেলায় পাঠক হয়ে উঠবেন বিশিষ্ট এবং সর্ববিদ্যাবিশারদ, আর গদ্যরচনা পড়বার বেলায় হয়ে যাবেন সাধারণ অর্থাৎ যে কোনো 'দুরূহ' বিষয়ে প্রবেশাধিকারের অযোগ্য। তেমন সাধারণ পাঠককে যদি গদ্য-প্রবন্ধকার তাঁর প্রসাদগুণেই প্রসন্ন করতে না পারেন তা'হলে সেই লেখকের "শির লে আও।" প্রাজ্ঞন কাব্যের অনুরাগীরা এ দাবী করলে তবু তাঁদের দাবীতে একটা সামঞ্জস্য থাকে, বলা যায় তাঁরা সর্বত্রই সহজিয়াপন্থী, সরল রেখায় চলতে অভ্যস্ত। কিন্তু আধুনিক কবি ও কাব্যানুরাগীদের মুখে এ-হেন দাবী বড় অদ্ভুত শোনায়।

আ. স. আইয়ুব

সমালোচনা

The Domestic Servant Class in 18th Century England. *By* J. Jean Hecht. Routledge & Kegan Paul. London. 25*s*.

সামাজিক ইতিহাস রচনায় যাঁরা সিদ্ধহস্ত তাঁদের মধ্যে ইংরেজ ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান অন্যতম। এক্ষেত্রে জীন হেখ্‌ট একেবারে নবাগত না হলেও, অভিজ্ঞতায় নবীন। তাঁর অনুসন্ধানী মনের নবীনতা বিস্ময়কর। সমাজের অনাদৃত আনাচকানাচ থেকে এমন সব উপকরণ তিনি সংগ্রহ করতে পারেন, ঐতিহাসিকের কাছে যা অমূল্য সম্পদ। সেই ধরনের উপকরণ আহরণ করে জীন হেখ্‌ট সম্প্রতি যে 'অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের গৃহভৃত্যশ্রেণীর' ইতিহাস রচনা করেছেন, তা সমাজেতিহাস-সাহিত্যের সম্ভার নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করবে।

ট্রেভেলিয়ান তাঁর বিখ্যাত বইয়ের* ভূমিকায় সামাজিক ইতিহাসরচনার লক্ষ্য, পদ্ধতি, উপকরণ-সন্ধান, নির্বাচন ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছেন, তা আলোচ্য বই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন, সামাজিক ইতিহাসের 'নেগেটিভ' সংজ্ঞা হ'ল, যা রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, তাই সামাজিক ইতিহাস। তারপর কথাটাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কোন জাতির ইতিহাস থেকে রাজনীতি বর্জন করা অবশ্য শক্ত, কিন্তু জাতির ইতিহাসের নামে সমাজবর্জিত রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত এত বেশি রচনা করা হয়েছে যে এখন তার অভাবপূরণের জন্য বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করাও দোষের নয়। আমাদের জীবদ্দশায় তৃতীয় আর-এক ধরনের ইতিহাসরচনার প্রচলন হয়েছে, তার নাম অর্থনৈতিক ইতিহাস। তার ফলে অবশ্য সামাজিক ইতিহাসরচনার সুবিধা হয়েছে যথেষ্ট। কারণ বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য থেকেই বিশেষ বিশেষ সামাজিক জীবনযাত্রার উদ্ভব হয় এবং সেই বিশেষ সমাজ-জীবন থেকে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উৎপত্তি হয়। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে, সমাজেতিহাস ভিন্ন অর্থনৈতিক ইতিহাসের বন্ধ্যত্ব ঘোচে না এবং রাজনৈতিক ইতিহাস জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করাই সামাজিক ইতিহাসের লক্ষ্য নয়। তার নিজস্ব কর্তব্যও কম নয়। অতীত কালের লোকজন কিভাবে প্রাত্যহিক জীবনযাপন করত, কি চিন্তা করত, কল্পনা করত, ধর্ম শিক্ষা সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে কেমনভাবে তাদের সংস্কৃতি প্রকাশ হত—এসব বিষয় সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্গত। কিন্তু অতীতের এসব কথা জানা কত কঠিন। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদরা প্রাচীন দলিলপত্র, চিঠিপত্র, পত্রিকা ইত্যাদি ঘেঁটে অতীতের কত অজানা তথ্য পুনরুদ্ধার করেছেন। কেবল এইগুলি পাঠ করতে যে কোন লোকের সারাটা জীবন কেটে যেতে পারে। তারপরেও মনে হয়, এসব তথ্যও

* G. M. Trevelyan—*English Social History*.

যথেষ্ট নয়। যদি লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রত্যেকের জীবনকাহিনী জানা যেত, তাহলে সামাজিক ইতিহাস রচনার সুবিধা হত। তা যখন জানবার উপায় নেই তখন সমাজেতিহাস রচয়িতাকে কয়েকটি বিশেষ-নির্বাচিত বিষয়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। সমগ্র সামাজিক সত্যের সম্পূর্ণ জটিলতা তাতে প্রকাশ পেতে পারে না। কিন্তু তা ছাড়া পথও নেই। ট্রেভেলিয়ানের নিজস্ব উক্তি হল :

The generalisations which are the stock-in-trade of the Social historian, must necessarily be based on a small number of particular instances, which are assumed to be typical, but which cannot be the whole of the complicated truth.

এ-উক্তির অর্থ সমাজেতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের অনুধেয়। সুনির্বাচিত তথ্য ও 'টিপিক্যাল' তথ্য-গ্রন্থন ভিন্ন সামাজিক তথ্যের অগাধ সমুদ্রে ঐতিহাসিকের লক্ষ্যতরী দিকভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা। একশ্রেণীর ঐতিহাসিক আছেন, তথ্যের যান্ত্রিক ক্যাটালগিং যাঁরা পবিত্র কর্তব্য মনে করেন। দিকনির্ণয়ের, অথবা সূত্রায়নের পক্ষপাতী নন তাঁরা। আমাদের দেশে এখনও ঐতিহাসিক এষণা চর্বিত তথ্যবর্ণের এই আদিম স্তরে নিবদ্ধ।

At bottom, I think, the appeal of history is imaginative. Our imagination craves to behold our ancestors as they really were, going about their daily business and daily pleasure. Carlyle called the antiquarian or historical researcher 'Dryasdust'. Drysdust at bottom is a poet.

ট্রেভেলিয়ানের এ-উক্তি অবিস্মরণীয়। ধূলিরুক্ষ তথ্যান্বেষী যদি কবি-কল্পনাবর্জিত হন, তাহলে সামাজিক ইতিহাসরচনার স্পৃহা তাঁর ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। জন হেথট 'ড্রাই-অ্যাজ-ডাস্ট' অন্বেষক হয়েও কবিধর্মী। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ সমাজ থেকে তাই এমন একটি 'টিপিক্যাল' বিষয় তিনি নির্বাচন করেছেন, যা আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য হলেও, তখনকার জীবনযাত্রার বহু আবছা-অজানা দিকগুলিতে অপ্রত্যাশিত আলোকসম্পাত করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজেতিহাসের অন্বেষণক্ষেত্রের সাংস্থানিক চিত্র যে কত জটিল এবং অনুজু রেখায়নে পরিক্ষিপ্ত, জন হেথটের আলোচ্য গ্রন্থপাঠে তার আভাস পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের গৃহভৃত্যশ্রেণীর জীবনেতিহাস, তাৎকালিক সমাজের সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের মানুষের জীবনকে নানাদিক থেকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর বিশ্লেষণরশ্মির তাঁর বিচ্ছুরণে সাম্প্রতিক সমাজের অস্থিবিন্যাসের আকালিকতা বা অ্যানাক্রনিজ্‌ম পর্যন্ত ধরা পড়েছে। এইখানেই তাঁর সমাজেতিহাস রচনার প্রয়াস সার্থক হয়েছে মনে হয়।

সামাজিক ইতিহাসরচয়িতার তল্লাসযোগ্য তথ্যকন্দরের মধ্যে প্রধান হল, দিনপঞ্জী স্মৃতিকথা চিঠিপত্র, প্রাচীন পত্রিকা ও সংবাদপত্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সাহিত্য। জন হেথট সব কটি কন্দর থেকেই পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 'ভূমিকায়' তিনি বলেছেন :

A good deal of the material employed in the study has been extracted from the usual quarries of the social historian: diaries, memoirs, letters, magazines, newspapers, the accounts of travellers, and literary works. Much has also been taken from pamphlets and treatises on social and economic problems of the day. And, of course, a wealth of data has been drawn from contemporary works on service, servants, and household management.

প্রথম অধ্যায়ে হেথট ভৃত্যদের 'চাহিদা' ও 'সরবরাহ' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে বিভিন্ন চাকুরিজীবীশ্রেণীর মধ্যে ভৃত্যশ্রেণী বৃহত্তম শ্রেণী ছিল। মধ্যযুগ তখন অস্তমিত, তা সত্ত্বেও গৃহভৃত্যের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ কি? এই সময় ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার যে অভিদ্রুত পরিবর্তন হয়, তার ফলেই ভৃত্যশ্রেণীর চাহিদা বাড়তে থাকে এবং চাহিদা অনুপাতে সরবরাহও ক্রমে বৃদ্ধি পায়। শিল্পবাণিজ্যের বিস্তারের ফলে সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়। একদা যারা অখ্যাত ও অজ্ঞাত ছিল সমাজে, অর্থোপার্জনের নানারকম স্বাধীন সুযোগ পেয়ে তারা নিজেদের শ্রেণীমর্যাদা স্থাপনে সক্ষম হয়। নতুন নতুন ধনিক অভিজাত বংশ গড়ে ওঠে। নতুন ঘরবাসী, নতুন পরিবারের সংখ্যা বাড়ে। বাণিজ্যযুগের নতুন সংগতিপন্ন বণিকশ্রেণী আভিজাত্যের প্রতিযোগিতায় সেকালের লর্ড-ডিউকদের হার মানাতে চান। তাঁদের জন্য বিলাসিতার সমস্ত উপকরণের চাহিদা বেড়ে যায়। এই সব উপকরণের মধ্যে ঘরবাড়ী আসবাবপত্তর পোষাক-পরিচ্ছদের মতন চাকরচাকরাণীও অপরিহার্য। নতুন ধনিক বণিক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাসিতার বাসনা চরিতার্থের জন্য চাকরশ্রেণীর চাহিদা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বাড়তে থাকে। দুদিকের চাপেই বাড়তে থাকে। এদিকে নতুন অভিজাতশ্রেণী জাঁকজমকের বাহুল্যের জন্য যেমন লালায়িত হয়ে ওঠেন, তেমনি ওদিকে বনেদী অভিজাত যাঁরা, তাঁরা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর 'চ্যালেঞ্জে' নিজেদের অপসৃয়মান সামাজিক মর্যাদারক্ষার জন্য আরও বেশি সচেতন হন। সামর্থ্যের অতীত হলেও, চাকর পোষার প্রয়োজন তাঁরা আরও বেশি করে অনুভব করতে থাকেন। শিল্পবাণিজ্যযুগের নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে, উদীয়মান ও অস্তমান অভিজাতশ্রেণীর এই মর্যাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে, দুই শ্রেণীর পক্ষ থেকেই চাকরশ্রেণীর চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যায়। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে তাই চাকুরিজীবীদের মধ্যে গৃহভৃত্যরাই প্রধান হয়ে ওঠে।

যে পরিবারে চাকরচাকরাণীর সংখ্যা যত বেশি, সেই পরিবারের সামাজিক মর্যাদা তত বেশি। চাকরই মর্যাদার প্রামাণ্য মানদণ্ড। স্কুলের ছাত্রছাত্রী বালকবালিকারাও সে-সম্বন্ধে সচেতন। জনৈক পাদরি সাহেবের কন্যা তাঁর বাল্যজীবনের স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

I was interrogated by many of the young ladies as to the station of my father, or rather respecting the figure he made in the world. 'Does your papa keep a coach'?—'No'—'How many servants have you?'—'Four'—'Dear; only think Miss's papa does not keep a coach, and they have only four servants. (*Memoirs of the Life of the Late Mrs. Catherine Cappe*, 1824, p. 40, Quoted by Hecht).

মধ্যযুগের লর্ডদের তুলনায় নবযুগের উচ্চশ্রেণীর চাকরের বিলাসিতা অবশ্য অনেক কম ছিল। তখন লর্ডদের পরিবারে শতাধিক ভৃত্যপোষণ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালে ওয়ারিকের আর্ল ৬০০ জন চাপরাসী নিয়ে পার্লামেণ্টে যেতেন। তাঁর চেয়ে ক্ষুদ্রতর জীব, কেণ্ডলের ডেপুটি-স্টিউআর্ড যেতেন ২৯০ জন চাপরাসী নিয়ে। ক্রমে এই চাকরের সংখ্যা এই সব পরিবারে কমতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে গড়পড়তায় শ'খানেকে দাঁড়ায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও কমে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা যায়, পরিবারপ্রতি ভৃত্যসংখ্যা চল্লিশ-পঞ্চাশ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরিবারের আয়তনহ্রাসের সঙ্গে তুলনা করলে এ-সংখ্যাও যথেষ্ট বেশি। জন হেথট অনেক পরিবারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে দশ থেকে পনেরকুড়িজন ভৃত্য প্রতিপালিত

হত। পরিবার ও ভৃত্যসংখ্যার তালিকা দিয়ে হেখট তা ভাল করেই প্রমাণ করেছেন।

প্রত্যক্ষ তথ্যাশ্রিত বিশ্লেষণ ছাড়াও হেখট সমাজবিজ্ঞানের প্রত্যয় প্রয়োগ করে সমস্যাটি বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। যেমন, নাগরিক সমাজে, লণ্ডনের মতন বর্ধিষ্ণু শহরে, ভৃত্যসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে ব্যক্তিগত সম্পর্কশূন্য সমাজে বাহ্যরূপের পরিচয়টাই প্রধান হয়ে ওঠে। নাগরিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার নৈর্ব্যক্তিকতা। মধ্যযুগের গ্রাম্যসমাজের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিসম্পর্ক ও কুলগত পরিচয়ের বন্ধন অনেক দৃঢ় ছিল। সেখানে বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন হত বিলাসিতার জন্য বা পদমর্যাদার জন্য, আত্মপরিচয়ের জন্য নয়। নাগরিক সমাজে 'ব্যক্তি' হিসেবে সকলেই অজ্ঞাতকুলশীল। কৌলিক পরিচয়ের মূল্য সেখানে অল্প ও সতত পরিবর্তনশীল। বস্তুত, নৈর্ব্যক্তিক নাগরিক সমাজে নৈকষ্য কৌলীন্যের দাবি তাঁদেরই গ্রাহ্য হয় যাঁদের বাইরের বিত্তসমারোহ যত বেশি। সুতরাং নতুন শহরে আভিজাত্য ও ভদ্রতার উপচারবৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। আত্মমর্যাদা ঘোষণার তাগিদে লণ্ডনের মতন শহরে তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভৃত্যশ্রেণীর কলেবর স্ফীত হয়েছিল। মধ্যযুগের বড় বড় বনেদী যৌথ পরিবার ভেঙে ক্ষুদ্রায়তন হলেও এবং তার পোষ্য ভৃত্যসংখ্যা পূর্বের তুলনায় কমে গেলেও, সমাজের নতুন শ্রেণীবিন্যাসে যেহেতু বিত্তবান শিল্পপতি, বণিকশ্রেণী ও মধ্যবিত্তের সংখ্যাপ্রাধান্য বাড়ছিল, সঙ্গতিপন্ন পরিবারের সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছিল, সেই হেতু চাকরচাকরাণীর মোটসংখ্যাও চাহিদানুপাতে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছিল। এই সময় তাই সর্বশ্রেণীর চাকুরিজীবীর মধ্যে চাকররাই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হয়েছিল।

ভৃত্যশ্রেণীর চাহিদাবৃদ্ধির সামাজিক কারণ বিশ্লেষণ করে জীন হেখট তার সরবরাহের কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের এই অংশটুকু, পুরাতন সমাজের ভাঙন ও নতুন সমাজের গড়নের ইতিহাসের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে। ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি যাঁদের আছে তাঁরা ইতিহাসের ভাঙাগড়ার অন্তর্নিহিত এই ছন্দটিকে আবিষ্কার না করে তৃপ্ত হন না। তা না করতে পারলে, স্তূপীকৃত তথ্যের পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করবার পরেও চারিদিকে চেয়ে কেবল অর্থহীন শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। জীন হেখট প্রধানত সমাজবিজ্ঞানী, তাই তিনি এই ধরনের শূন্যবাদী ইতিহাসচর্চার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। আলোচনার প্রত্যেক স্তরে তথ্যানুগ হয়েও তিনি তাঁর প্রমাণ দিয়েছেন যথেষ্ট।

সমাজের কোন্ স্তর থেকে এই ভৃত্যশ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে হেখট দেখেছেন যে গ্রামের কৃষকশ্রেণীর স্তর থেকেই চাকরচাকরাণীর আমদানি হত বেশি। তার মধ্যে চাষীদের ছেলেমেয়ে ও ক্ষেতমজুররাই প্রধান। গ্রামের ভূস্বামীরা নিজেদের জমিদারীর অধীন চাষীপ্রজাদের ভিতর থেকে চাকরচাকরাণী রেক্রুট করতেন, কারণ তাতে ভৃত্যদের বশ্যতা ও প্রভুভক্তি সম্বন্ধে তাঁরা অনেক বেশি নিরুদ্বিগ্ন হতে পারতেন। ক্ষুদে জমিদার, অর্থাৎ এখনকার গাঁতিদার জোত্‌দারদের সমকক্ষ যাঁরা, তাঁরা অনেক সময় আশপাশের কোন বড় জমিদারী থেকে ভৃত্য নিয়োগ করতেন, দূরাঞ্চলের লোক পছন্দ করতেন না। তারও কারণ ছিল ঐ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা। লক্ষণীয় হল, গ্রামের এই শ্রেণীর লোক যারা চাকরের পেশা গ্রহণ করত, সাধারণত তারা গ্রামাঞ্চলে থাকতে চাইত না, শহরে আসতে চাইত। শহরের ভৃত্যপালকরাও গ্রামের ভৃত্য নিয়োগ করতে

চাইতেন, তার কারণ শহরের ভৃত্যদের কুকর্মপ্রবণতায় তাঁরা বিচলিত হতেন। তা সত্ত্বেও অবশ্য অভিজ্ঞ শহুরে চাকরদের বিশেষ কর্মদক্ষতার জন্য চাকরির অভাব হত না। মুখ্য ভৃত্যের কাজ গ্রাম্যরা পেত না, শহুরে চাকরের অধীনে ছোট পদে বহাল হয়ে তাদের কাজ করতে হত।

গ্রাম্য ভৃত্যরা গ্রামে না থেকে শহরে আসতে চাইত একাধিক কারণে। শহরের আকর্ষণ গ্রামের তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশি ছিল এবং তার বৈচিত্র্যও ছিল। শহরের বেতন, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, জীবনযাত্রা ভৃত্যশ্রেণীরও কাম্য হওয়া স্বাভাবিক। শহরের ভৃত্যরা ছুটির দিনে গ্রামে ফিরে গিয়ে এই সব নাগরিক সুখের কথা গ্রাম্য মজ্‌লিসে বর্ণনা করত। গ্রাম্য ভৃত্যদের নগরাকর্ষণ আরও তীব্র হত তাতে। সমসাময়িক একজন লেখক এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

> The plough-boys, cow-herds, and lower-hinds, are debauched by the appearance and discourse of those coxcombs in livery, when they make their summer excursions. They desert their dirt and drudgery, and swarm up to London, in hopes of getting into service, where they can live luxuriously and wear fine clothes. (Smollet's *Humphry Clinker*, Works, VII, 108, quoted by Hecht.).

এ ছাড়া, গ্রামাঞ্চলের নতুন 'এনক্লোজার' নীতিও ভাসমান ভৃত্যশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হয়েছিল। পুরাতন গ্রাম্যসমাজের ভিত্ ভেঙে দিয়েছিল এনেক্লাজার নীতি। ভূসম্পত্তির অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠার জন্য এই যে এক-এলাকাভুক্তির অভিযান, এর আঘাত স্বল্পবিত্ত দরিদ্র খণ্ডভূমির মালিক প্রজাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। তারা কৃষিজীবী থেকে শ্রমজীবীশ্রেণীতে রূপান্তরিত হল। একীকরণের ফলে যেখানে আবাদী জমি চারণভূমিতে পরিণত হল (পশমব্যবসায়ীদের ভেড়ার পালের জন্য), সেখানে গ্রাম-কে-গ্রাম উৎসন্নে গেল। গ্রামবাসীরা নগরাভিমুখী হতে বাধ্য হল। নতুন নগরে কারখানার মজুরের চাইতেও তখন গৃহভৃত্যের চাহিদা বেশি। কারখানা বসছিল, কিন্তু তার চাইতে আরও দ্রুত হারে মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা বাড়ছিল। সুতরাং মজুরশ্রেণীর তুলনায় ভৃত্যশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছিল লণ্ডনে ও তার আশেপাশে। নবযুগের সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের প্রথম পর্যায়ের এই বৈশিষ্ট্যটি জীন হেখট সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রমশিল্পের ও কলকারখানার ক্রমিক প্রসারের ফলে ভৃত্যশ্রেণী ধীরে ধীরে শ্রমজীবীশ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে তার জন্য পরিবারে ভৃত্যসঙ্কট দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা, ইংলণ্ডে উনিশ শতকের প্রথম পাদে শিল্পবিপ্লব সার্থক হলেও, শেষপাদ থেকে এই লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে যেমন সম্প্রতি নাগরিক পরিবারে, একই কারণে, এই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে।

কেবল কৃষকশ্রেণীর স্তর থেকেই ভৃত্যের আমদানি হত না, গ্রামের কারুশিল্পী, দোকানদার ও কারিগরদের মধ্য থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে হত। এ-সম্বন্ধে হেখট তথ্য-প্রমাণসহ উক্তি করেছেন :

> In addition to the agrarian population the artisan class of the rural regions also contributed to the supply of domestics . . . In London, too, and in the smaller towns, the children of craftsmen and manufacturers were taken as domestics. Thus, arguing in 1763 that certain industries

were undermanned, an essayist lamented the diversion of young hands from productive work: (*London Chronicle*, 1763, XIII, Quoted by Hecht).

নাগরিক আকর্ষণ এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে গ্রাম্য পেশার বংশানুক্রমিক বন্ধন ছিন্ন করেও শিল্পীকারিগরদের মন নগরাভিমুখে ধাবমান হত। কেবল নাগরিক বিলাসিতার ও স্বাচ্ছন্দ্যের বৈচিত্র্যই যে একমাত্র আকর্ষণ ছিল তা নয়, তার চাইতে আরও অনেক বড় আকর্ষণ ছিল নতুন নাগরিক সমাজের আন্তঃশ্রেণিক গতিশীলতা (ইণ্টার-ক্লাস মোবিলিটি)। গ্রাম্য শ্রেণীবিন্যাস নিশ্চল, নাগরিক শ্রেণীবিন্যাস সচল। গ্রাম্য কর্মকারের গ্রাম্যসমাজের শীর্ষস্তরে আরোহণ করার কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই। নাগরিক সমাজে সে স্বচ্ছন্দে জীবনসংগ্রামের সাফল্যের জোরে শীর্ষস্তরে উঠতে পারে। নগরজীবনের এই বন্ধনহীন গতিশীলতাই ছিল প্রধান আকর্ষণ, যার জন্য কেবল কৃষিজীবীরা নয়, শিল্পজীবীরাও নগরে এসে ভিড় করত এবং প্রথমে ভৃত্যশ্রেণীভুক্ত হয়ে নগরবাসের ব্যবস্থা করত।

নানারকমের গ্রাম্য মেলায় ও হাটবাজারে কিভাবে চাকুরিপ্রার্থী চাকরচাকরাণীদের সমাবেশ হত, জীন হেখট তারও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। পরিবারের কর্তারা এই সময় মেলায় ও বাজারে গিয়ে, দরদস্তুর করে, চরিত্রপত্র দেখে, ভৃত্য পছন্দ করতেন। শহরের কাছাকাছি সরাইখানাতেও ভৃত্যরা এসে জমা হত। গ্রাম্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আসত তারা এবং শহরবাসীরা সরাইয়ের মালিকের কথায় তাদের কাজে নিয়োগ করতেন। রেজিস্টার আপিসও ছিল ভৃত্যদের জন্য। মালিক ও ভৃত্যরা উভয়েই 'ফি' দিয়ে নাম লিখিয়ে রাখত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ভৃত্য মালিক পেত, মালিকও ভৃত্য পেত। এই সব নিয়োগকেন্দ্র দুর্নীতির প্রশ্রয়ও দিত যথেষ্ট। গ্রাম্য মেয়েরা, যারা চাকরাণীর কাজের সন্ধানে আসত শহরে, তাদের জাল মালিকের হাত দিয়ে নগরের বারাঙ্গনাপল্লীতে চালান করারও কোন অসুবিধা হত না।

ভৃত্যশ্রেণীর চাহিদা ও সরবরাহ-সমস্যার নানাদিক সম্বন্ধে আলোচনা করে, হেখট পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যথাক্রমে "ভৃত্যদের পদবিন্যাস", "প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক", "ভৃত্যদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য", "আমোদ-প্রমোদ অবসর", "আর্থিক পুরস্কার" ও "সামাজিক অগ্রগতি" সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কেবল জ্ঞাতব্য তথ্যের দিক থেকে নয়, সামাজিক ইতিহাসের ধারা-বিশ্লেষণের অপূর্ব নৈপুণ্যের দিক থেকে প্রত্যেকটি অধ্যায় বারংবার পঠিতব্য। এত তথ্য এবং তথ্যান্তর্গত ভাবসম্পদ এত সমৃদ্ধ যে সমালোচনার স্বল্প-পরিসরে তার আভাস দেওয়াও দুরূহ।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে আমার মনে হয়েছে। এই অধ্যায়ে জীন হেখট প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, কিভাবে এই ভৃত্যশ্রেণী তখনকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। দেবতার বাহনের মতন, সমাজের উচ্চশ্রেণীর বাহন হয়ে, নিজেদের অনুচীকির্ষার জন্য, ভৃত্যরা প্রভুদের 'মডেল' হয়ে সমাজে চলতে চেয়েছে। সে-বাসনা হাস্যকর হলেও, অদম্য এবং তার প্রকাশও অপ্রতিরোধ্য। উচ্চশ্রেণীই সমাজে সংস্কৃতির ধারক, কিন্তু তার বাহক সেই শ্রেণী-বহির্ভূত সাধারণ মানুষ। ভৃত্যশ্রেণী এই বাহকদের মধ্যে এক সময় নাগরিক সমাজে অগ্রগণ্য ছিল। উপরতলার আচরিত সংস্কারের পরিচয় নিচের তলায় তারা বহন করে

আনত এবং সাংস্কৃতিক প্রসার ও লেনদেনের পথ প্রশস্ত করে দিত। কি ভাবে করত?

In one way or another, then, the subordinate classes gained a certain familiarity with the manners of the elite; and for the most part, they sought to imitate it as closely as possible. This was natural. In virtually all societies that possess social solidarity the highest social strata tend to be taken as models by the strata beneath. Imitation may not be carried very far; in fact, where there are specific tabus against it, or where there are wide fissures in the social structure, it may scarcely occur at all. Nevertheless, the tendency normally exists; and in eighteenth-century England it existed under optimum conditions (Pp. 203-204).

হেখটের এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তি প্রণিধানযোগ্য। সংস্কৃতির বাহক হিসেবে ভৃত্যশ্রেণী, সমাজের উপরের স্তর থেকে সাধারণ স্তরে, কোন্ জাতীয় উপাদান বহন করে নিয়ে যেতে পারে, সে-সম্বন্ধে অনেকে কৌতূহলী হতে পারেন। তথ্যপ্রমাণসহ জীন হেখট এ-সম্বন্ধে উত্তর দিয়েছেন যে, পোষাক-পরিচ্ছদ, আদবকায়দা, আচারব্যবহার, অভ্যাস, ধ্যানধারণা, সবই ভৃত্যরা বহন করে নিয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিক আদর্শ থেকে হ্যাট্ পরার ভঙ্গি পর্যন্ত ভৃত্যদের মধ্য দিয়ে সমাজে প্রচলিত হওয়া সম্ভব :

The cultural elements thus relayed were of all sorts: articles of clothing, gestures, moral values, ideas. A new attitude towards church or state was as likely to be passed on as a new way of cocking a hat . . . During the whole of the preceding century servants had been similarly effective in disseminating their employers' views (Pp. 221-222).

গৃহভৃত্যশ্রেণীর এই সাংস্কৃতিক ভূমিকা উদ্ঘাটনে জীন হেখট সফল হয়েছেন এবং এই সাফল্যের মধ্যেই তাঁর ভৃত্যশ্রেণীর সামাজিক ইতিহাসরচনা সবচেয়ে বেশি সার্থকতা লাভ করেছে। সংগৃহীত তথ্যসম্ভারের ভিতর থেকে তিনি সমাজেতিহাসের অন্তঃসলিলা প্রাণপ্রবাহটি খনন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন এবং চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। একাজ সম্ভব হয়েছে, কারণ হেখট কেবল ইতিহাসের অনুরাগী নন, সমাজবিজ্ঞানেরও অনুশীলক। তাই যে অন্তর্দৃষ্টি ও তথ্যাতীর্ণ কল্পনাশক্তি ভিন্ন কোন ইতিহাসেষণাই কখন সার্থক হতে পারে না, হেখটের তা অভাব হয়নি। আমাদের দেশের ইতিহাসরচনা এখনও তথ্য-সংকলনের প্রাথমিক স্তরে আবদ্ধ। ঐতিহাসিকদের একপেশে বিশেষজ্ঞতা তথ্যাতিরিক্ত কল্পনার পরিপন্থী। তাই এদেশে 'ক্রনিকেল' শ্রেণীর ইতিহাস যত লেখা হয়েছে, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস তার শতাংশের একাংশও হয়নি। যাঁরা ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন এবং ইতিহাসের ছাত্র, তাঁদের সকলেরই কর্তব্য এই অন্বেষণ-বিশ্লেষণ পদ্ধতির পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে সংযোগ রাখা। যে-ভৃত্যশ্রেণী হেখটের আলোচ্য বিষয়, তারা ইংলণ্ডের ও লণ্ডনের। আমাদের বাংলাদেশে ও কলকাতা শহরেও অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে এই ভৃত্যশ্রেণীর বিচিত্র সমাগম ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল। তার ইতিহাস রচনা করতে পারলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি বড় অধ্যায় রচনা সম্পূর্ণ হতে পারে, এবং সমাজের নানাদিক ভৃত্যদের জীবনালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। জীন হেখটের বইখানি পড়তে পড়তে এই কথাই আমার বারবার মনে হচ্ছিল।

বিনয় ঘোষ

সাহিত্য-চিন্তা—শিবনারায়ণ রায়। মিত্রালয়। কলিকাতা। দাম চার টাকা।

শিবনারায়ণ রায়ের চিন্তা সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মানববর্ষম, মানুষের বিকাশ এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের অগ্রগতির সমস্যা তাঁর পুস্তকের চিন্তার অন্তর্গত। যেহেতু মানুষের সব-কিছু নিয়েই সাহিত্যের কারবার, সেই হেতু কোনো চিন্তাই সাহিত্য-চিন্তার বাইরে নয়—এই বিশ্বাস থেকেই বোধ হয় তিনি তাঁর আলোচনাকে প্রচলিত সাহিত্য-ব্যাপারের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি। আর মনুষ্যধর্ম ও সমাজের যাবতীয় সমস্যার মূল প্রকৃতি এবং সমাধানের পথ সম্বন্ধে তাঁর নিঃসংশয় প্রতীতি, তাঁকে এই বৃহত্তর ও আপাতদৃষ্টিতে গভীরতর আলোচনায় উৎসাহিত করেছে। তদুপরি, লেখক পণ্ডিতম্মন্য এবং পাণ্ডিত্য-বিলাসী। তার ফলে তিনি আলোচনার মধ্যে বিষয়গত যাথার্থের সংযমের চেয়ে চিন্তার দ্বিধাহীন বিচরণ এবং পাণ্ডিত্যের রোমহর্ষক ব্যাপ্তিকেই বেশি মূল্য দিয়েছেন। ডুয়েরের-এর ড্রয়িং আর লেওনার্দোর স্কেচ, প্রোটাগোরাসের মানবীয় মূল্যবোধ আর লোরেঞ্জো ভালার সম্ভোগ-তত্ত্ব, আরিওস্তোর অর্লান্দো ফুরিওসো আর পাঁতাগ্রুয়েল-এর আজব কাহিনী, সিয়েহ্ হো-র শিল্প-সূত্র আর উচ্চেল্লো-র পরিপ্রেক্ষিতবোধ, এমন কি "মুশা হতে মহম্মদ, যাজ্ঞবল্ক্য হতে যীশু"—কেউ-ই বা কিছু-ই এই আলোচনা থেকে বাদ যায়নি।

তা হলেও, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এত সব বিভ্রান্তিজনক নাম ও উদ্ধৃতির মধ্যেও লেখকের মূল বক্তব্য একেবারে চাপা পড়েনি। বক্তব্য-প্রকাশের উগ্রতা এবং নিরন্তর পুনর্বিবৃতি বক্তব্যকে স্পষ্ট রাখতে সাহায্য করেছে।

আলোচনা সুরু প্লেটোর বহু-বিশ্লেষিত এবং অধুনা বহু-নিন্দিত সাহিত্য-বিচার থেকে। প্লেটোর সত্য-দর্শন ভ্রান্ত, কারণ "সত্য জ্ঞানের উপাদান এবং শেষ পর্যন্ত সব জ্ঞানই ইন্দ্রিয়নির্ভর"। জ্ঞান ইন্দ্রিয়নির্ভর বলেই সম্পূর্ণ বা নিত্য নয়, বিকাশধর্মী। সত্য আপেক্ষিক। কিন্তু তথাকথিত মহাপুরুষ বা দার্শনিকরা আংশিক জ্ঞানকে নিত্যসত্য বলে প্রচার করেন এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির নির্দেশ বলে এই জ্ঞানকে সর্বজনগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেন। সাহিত্যিক অভিজ্ঞতানির্ভর, আপেক্ষিক, পরিবর্তনশীল সত্যকে অনুসরণ করেন; তিনিই প্রকৃতভাবে সত্যসন্ধ। তাঁর চোখে প্রতি ব্যক্তি অনন্য, অদ্বিতীয়, মূল্যবান; তাঁর কাছে ব্যক্তির বিকাশই প্রথম ও শেষ কথা। এই বিকাশের অবলম্বন ব্যক্তির যুক্তিবুদ্ধি ও মুক্তিস্পৃহা। এই ব্যক্তিবিকাশের ব্যাপক সূচনা য়ুরোপের রেনেসাঁস আন্দোলনে। রেনেসাঁসের জীবনদর্শন থেকেই আমাদের পথনির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। এই জীবনদর্শনের মূল কথা এই যে মানুষ-ই সবকিছুর মাপকাঠি এবং মানুষই মনুষ্যত্বের একমাত্র উৎস। প্রতি মানুষের মনে অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে—তার বিকাশের প্রকৃষ্ট পথ আত্মবিলোপ নয়, সম্ভোগ। পরম আদর্শ কোনো আধ্যাত্মিক সত্তা নয়, মানবতন্ত্রের আদর্শ বৈশ্বিক মানব।

প্রথম দুটি প্রবন্ধে লেখক প্রধানত এই বক্তব্যই প্রচার করতে চেয়েছেন, এবং এই বক্তব্য-ই লেখকের অন্যান্য প্রত্যয় ও বিশ্লেষণের ভিত্তি। এই বক্তব্যের প্রকাশে ও বিশ্লেষণে মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতা এবং প্রচলিত দর্শনের মূঢ়তা নিয়ে লেখক বহু ব্যঙ্গ করেছেন এবং নিজের মতকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করে সজোরে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ঘোষণা যত প্রবল, লেখকের বিশ্লেষণ তত দৃঢ় নয়। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান-ই বিচারের এবং বিচার-নিষ্ঠ সিদ্ধান্তের একমাত্র উপাদান এ কথা লেখক শুদ্ধ স্বীকার-ই করেননি, এই কথাই প্রচলিত প্রত্যয় সম্বন্ধে তাঁর যাবতীয় পরিহাসের অবলম্বন। কিন্তু লেখকের নিজের সিদ্ধান্ত-

গঠনে এই কথার যথেষ্ট স্বীকৃতি নেই। প্রথম প্রশ্ন, অভিজ্ঞতার সংজ্ঞা কত ব্যাপক? লেখক ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকেই অভিজ্ঞতার সমগ্র সত্তা বলে গ্রহণ করেছেন এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে বুদ্ধির প্রয়োগেই জ্ঞানের উৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। বুদ্ধি কি তাহলে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বস্তু? এ-কথাও পাই যে অভিজ্ঞতা থেকেই বুদ্ধির বিকাশ। তাহলে বুদ্ধি কী বস্তু? জ্ঞানের সত্যতার ভিত্তি কি অভিজ্ঞতা, না বুদ্ধি, না বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার মিশ্রণে কোনো তৃতীয় গুণ বা সত্তা? জ্ঞানের সত্যতা নির্ধারণে যদি বুদ্ধির কোনো দান থাকে এবং বুদ্ধি যদি অভিজ্ঞতার আগের বা বাইরের কোনো জিনিষ হয় তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই সত্যের একমাত্র ভিত্তি এমন কথা বলা যায় না।

এটা কূটতর্ক নয়, যে কোনো তত্ত্ব আলোচনার প্রাথমিক সমস্যা। অভিজ্ঞতাকে যদি সত্যের একমাত্র ভিত্তি বলতে হয়—বলা উচিত বলেই আমি মনে করি—তবে অভিজ্ঞতার অর্থ আরো ব্যাপকভাবে ধরতে হবে। বিশ্বাস, তথাকথিত বিশুদ্ধ প্রত্যয়, যাবতীয় কল্পনা, মূল্যবোধ—এ-সবই ব্যক্তির সমগ্র অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। সমগ্র চেতনাই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র; এই ক্ষেত্রে অস্তিত্ববান সব কিছুই অভিজ্ঞতার উপাদান। যিনি সত্যসন্ধিৎসু তাঁর পক্ষে কোনো অভিজ্ঞতাকেই উপেক্ষা করবার উপায় নেই। বিশ্লেষকের কাছে চার্বাক ও শঙ্কর, প্রোটাগোরাস ও প্লেটো, ভল্‌টেয়ার ও প্যাসকাল—সকলের অভিজ্ঞতাই সমভাবে অস্তিত্ববান এবং সমগ্র সত্যের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের এই সমগ্র চেতনা এবং চেতনাচালিত কর্ম নিয়েই সাহিত্য-সৃষ্টি। সাহিত্যিক সেই হিসেবেই সত্যসন্ধ।

এ কথা স্বীকার করেও বস্তুসত্তা ও মূল্যসত্তার প্রভেদ নির্ধারণ সম্ভব। যে সত্তা আমাদের চেতনা-নিরপেক্ষ আর যে সত্তা আমাদের চেতনা-সৃষ্ট মূল্যবোধের অভিব্যক্তি তার প্রভেদ সম্বন্ধে অবহিত হলে বিশ্লেষণের পথ সুগম হয়। মূল্যসত্তায় বস্তুসত্তার মতো চেতনা-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আরোপ করার ফলেই ভাববাদী চিন্তার অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তি এড়াবার একমাত্র পথ বস্তুসত্তা থেকে আলোচনা সুরু করে মূল্যসত্তার প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা। কিন্তু ভাববাদী চিন্তার দুর্বলতা সম্বন্ধে শিবনারায়ণবাবু বিশেষভাবে সচেতন হলেও তার নিজের আলোচনা এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। তার ফলে, প্রচলিত ভাববাদী দর্শনের মূল্যসত্তা বর্জন করে তিনি যখন নতুন মূল্যসত্তাকে গ্রহণ করেছেন তখন এই সত্তার ভিত্তিকে বস্তুসত্তার অস্তিত্বের মতোই অবিচল বলে গ্রহণ করেছেন।

শিবনারায়ণবাবু বার বার বলেছেন যে মানুষ-ই মানুষের মূল্যবোধ বা নীতিবোধের একমাত্র উৎস। কিন্তু ভাববাদী দর্শনেও কি অন্য কোনো উৎস আছে? ব্রহ্ম, বা দেবত্ব—এ-ও তো মানুষের মূল্যবোধের-ই সৃষ্টি। এর যেমন কোনো বস্তুভিত্তি নেই, মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বা বিকাশের-ই কি কোনো বস্তুভিত্তি আছে? যে অর্থে আছে, শিবনারায়ণ রায় কি সে অর্থ গ্রহণ করবেন? সেই অর্থে মানুষ যেমন দয়াশীল বা বীর্যবান হতে পারে তেমনি নির্মম ও দুর্বল, অক্ষম হতে পারে। কোনো সম্ভাবনাকে আমরা মূল্যবান বা শ্রেয় মনে করি, কোনোটাকে মনে করি অবাঞ্ছনীয়। এ তো আমাদের মূল্য-বিচার। যে পরিণতি বাঞ্ছনীয় বা মহৎ, মানুষের "অন্তর্নিহিত" সম্ভাবনা সেই দিকে এমন কথা মনে করার কি কোনো বস্তুভিত্তি আছে? যে সম্ভাবনাকে আমরা কাম্য বা শ্রেয় মনে করি সেই সম্ভাবনার সার্থকতা-ই মনুষ্যত্বের বিকাশ এমন কথায় কারুর আপত্তি হবে না। কিন্তু কাম্য বা শ্রেয় যে কী সে প্রশ্নের সমাধান-ই তো মূল্যবোধের প্রকাশ।

অথচ, মানুষের বিকাশের কথা বলতে গিয়ে কতগুলি মূল্যসত্তার বিকাশের সম্ভাবনাকে

লেখক প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অমোঘ বলে ধরে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়। বলা হয়েছে যে ব্যক্তির স্বকীয় সম্ভাবনার বিকাশই সমাজ-সংগঠনের আদর্শ। যে ব্যক্তির বিকাশের সম্ভাবনা হিংসা ও দ্বেষে সেই ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশে সাহায্য করা কি কাম্য? যদি বলা হয় এই সব অবাঞ্ছনীয় পরিণতির দিকে মানুষের কোনো স্বাভাবিক প্রবণতা নেই, এবং "অন্তর্নিহিত" সম্ভাবনা জ্ঞান, প্রেম ইত্যাদি শ্রেয়বস্তুর দিকে, তবে অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। স্বাভাবিক বৃত্তি যে কী, আর তথাকথিত স্বাভাবিক বৃত্তির মধ্যে মূল্যবোধ দ্বারা নির্দিষ্ট অনুশীলনের ক্রিয়া কি পরিমাণ, এ প্রশ্নের মীমাংসা কঠিন।

আসলে, মানুষের "গূঢ়" বা "অন্তর্নিহিত" সম্ভাবনা সম্বন্ধে লেখকের ধারণা প্রায় আধ্যাত্মিক রহস্যে আবৃত। আর এই ধরনের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রকাশকেই তিনি যুক্তি-গ্রাহ্য, বিশ্লেষণ-নির্ভর তত্ত্ব বলে পরিবেশন করেছেন। "আত্মার পাপড়ি সংখ্যাহীন", "সত্যের অনুসন্ধানে সত্তার মুক্তি"—ইত্যাদি আপাত-গভীর উক্তিতে লেখকের আত্মতৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু বস্তুনির্ভর বা যুক্তিনির্ভর বিচার-বিশ্লেষণ হয় না। মুক্তির দোহাই দিয়েই যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের দায়িত্ব শেষ হয় না।

যুক্তি শিবনারায়ণবাবুর বড়ো অবলম্বন নয়, প্রধান অবলম্বন বিশ্বাস। তিনি মানুষের অবশ্যম্ভাবী শ্রেয় সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, সম্ভোগের মহৎ ফলে বিশ্বাসী, মুক্তিস্পৃহায় বিশ্বাসী। বিশ্বাস ছাড়া আমাদের কারুরই গতি নেই, এবং আমাদের বিশ্বাস যদি অপরের বিশ্বাসের সঙ্গে না মেলে তাহলে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ না হওয়াই ভালো। কিন্তু কেউ যদি এই বিশ্বাসকেই বস্তু-অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য বলে প্রচার করেন, আপত্তি উঠবে সেখানেই।

মানবতন্ত্রের মূলগত বিশ্বাস যা-ই হোক্ না কেন, এর বিকৃতি ও বিশ্লেষণে যখন যুক্তি ও বস্তুসত্যের বিকৃতি ঘটে তখন মনে হয় শেষ পর্যন্ত সব তন্ত্র-ই সমগোত্রীয়। যুক্তির বিকৃতি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করেছি। বস্তুসত্যের বিকৃতি-ও কম পীড়াদায়ক নয়। এই বিকৃতির মধ্যে-ও যথেষ্ট নিপুণতা নেই। তার ফলে পরস্পরবিরোধী উক্তির প্রাচুর্য। পশ্চিমী রেনেসাঁসের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই নাকি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার যাবতীয় প্রগতিমূলক চেষ্টা ও সৃষ্টি; অথচ লেখক অন্যত্র দুঃখ করেছেন যে রেনেসাঁসের সত্যান্বেষণ আর "বীর্যান্বিত ভোগবুদ্ধি"-র কোন চিহ্ন মেলে না ভিক্টোরিয় ইংরেজ-সমাজে। তাহলে কারা নিয়ে এলো আমাদের দেশে রেনেসাঁসের ঐতিহ্য? লেখক তো স্পষ্ট করেই বলেছেন "আমাদের সাহিত্যকল্পনা পুষ্ট হয়েছে স্কট-ওয়র্ডসোয়র্থ-টেনিসন-ডিকেন্সের ঐতিহ্যে"। যে দীনবন্ধু মিত্রের অশ্লীলতার প্রশংসায় লেখক উচ্ছ্বসিত, তিনি কি "পেত্রার্ক বোকাচ্চিও হতে শেক্সপীয়র সর্ভান্তেসের" ঐতিহ্যে পৃথক-ভাবে পুষ্ট?

য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের অভ্যুদয় ও বিকাশের যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন সে পরিচয় লেখকের মত সমর্থনের জন্য বিশেষভাবে সাজানো। ইতিহাস যে রেনেসাঁসের যুগের কথা বলে তার গতি ও প্রকৃতি এত সরল নয়। কিন্তু বস্তুসত্যের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করলে মত প্রচারের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকে না। কাজেই, অংশকে বা বিশেষ কতগুলি গুণকেই লেখক সমগ্র সত্য বলে পেশ করেছেন।

আর যেহেতু পৃথিবীর বা মানুষের ইতিহাসের যাবতীয় বস্তুকে লেখক এই রেনে-সাঁসের দান বলে ধরেছেন, সেই হেতু কাণ্ট মিলেছেন দেকার্ত-লকের সঙ্গে, দান্তে হয়েছেন চসারের সমগোত্রীয়। আর একই কারণে উপেক্ষিত হয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় শিল্প-

সাহিত্য সৃষ্টি যার প্রেরণা আধ্যাত্মিক, এমন কি ধর্মমূলক, মূল্যবোধ। যেখানে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি সেখানে এই সব সৃষ্টির মধ্যেও লেখক রেনেসাঁসের প্রভাব ও লক্ষণ আবিষ্কার করেছেন।

অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত—মনুষ্যসমাজের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রেনেসাঁসের ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া পৃথিবীরও গতি নেই, বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষেরও গতি নেই। সব চেয়ে হাস্যকর সমাজসংগঠনের ক্ষেত্রে রেনেসাঁসী সাধনার মোট সুফলের ইতিবৃত্ত—ইংলণ্ডের শ্রমিকসংগঠন আর মার্কিন দাসপ্রথার উচ্ছেদ। পর্বতের মূষিকপ্রসব। ছ'শো বছরের পৃথিবীর ইতিহাসে যাবতীয় পরিবর্তনের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা মূল্য সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্ত সম্ভব হতে পারে এ কথা ভাবা কঠিন।

এসব বক্তব্য চাঞ্চল্যকর, কোনো কোনো জায়গায় রীতিমতো হাস্যকর হলেও অস্পষ্ট নয়। অবশ্য, "বিকাশ", "সম্ভাবনা" ইত্যাদি কথার ব্যবহারে অনেক অস্পষ্টতা আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু বক্তব্যের অস্পষ্টতা সব চেয়ে পীড়াদায়ক "ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক" শীর্ষক তৃতীয় প্রবন্ধে। শব্দপ্রয়োগের কোনো সংযম, অর্থকে নির্দিষ্ট করার কোনো চেষ্টাই নেই এখানে। "প্রকাশের আকুতিহীন রূপ", "রূপের মধ্যে সত্তার উন্মোচন", "ব্যঞ্জিত সমন্বয়ে বিভেদের আশ্রয়", "চিত্তের মুক্তি", "প্রকাশের আক্ষেপ"—এই জাতীয় কথার রহস্যালোকে একবার প্রবেশ করলে বোঝা যায় কেন জনৈক আধুনিক দার্শনিক শিল্পতত্ত্বের আলোচনাকে বলেছেন "boring . . . . . and largely bogus" । তবুও, এ কথা জানা গেল যে "রোমাণ্টিকের দৃষ্টিতে সব অর্থসমৃদ্ধ প্রচেষ্টার মূল উৎস ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধে।" আগের আলোচনার আলোকে মনে হতে পারে ব্যক্তি-স্বকীয়তার চরম মূল্যে বিশ্বাসী লেখক তাহলে এই রোমাণ্টিক মার্গেরই লোক। কিন্তু ক্লাসিক-কে বর্জন করতেও লেখক রাজী নন; তার ধর্ম সমন্বয়ের। "উভয়েরই উদ্ভব দ্বৈতে, সার্থকতা অদ্বৈতে।" তবুও, লেখার ঝোঁক থেকে মনে হয় রোমাণ্টিক ব্যক্তি-স্বকীয়তার বোধই লেখকের মূল্যবোধের প্রধান আশ্রয়।

কিন্তু এ ধারণা বদ্‌লাতে হয় পরবর্তী প্রবন্ধে এসে। এখানে দেখি রোমাণ্টিক নিন্দনীয়; রেনেসাঁসী জীবনদর্শনের সঙ্গে "রোমাণ্টিক সত্যবিমুখতা", "রোমাণ্টিক ভাবালুতা"-র দুস্তর প্রভেদ। যাই হোক্, এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বাংলাসাহিত্যের জীবন-বিমুখতা, যার পরিচয় আমাদের শ্লীলতাবোধে। সম্ভোগবিদের অন্যতম কাম্য খিস্তির ভাষা। যে বঙ্কিমের প্রবন্ধ-উপন্যাসকে রেনেসাঁসী ঐতিহ্যের পরিচায়ক বলে লেখক পূর্বে উল্লেখ করেছেন, সেই বঙ্কিমকে এখন বর্জন না করে উপায় নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের লেখার মধ্যে কিছু গ্রাম্য-রসিকতা পাওয়া যাওয়ায় বিদ্যাসাগর রেনেসাঁস আর ফরাসী সাহিত্যের বিচারে জাতে উঠেছেন। দীনবন্ধু মিত্র তো আছেন-ই, আর শেক্সপীয়র-এর দু'একটা বাছা উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

বাকী প্রবন্ধের বিষয়—চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে, কবিতার কান, আধুনিক কবিতা ও পাঠক। এদের বিস্তারিত সমালোচনা এখানে সম্ভব নয়। লেখকের মূল বক্তব্য ও আলোচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে পরিচয় এ পর্যন্ত দিতে চেষ্টা করেছি সে পরিচয়ই বর্তমান পুস্তকের সমালোচনায় যথেষ্ট মনে করি।

মুক্তিস্পৃহা, বিশ্বমানবতা ইত্যাদি আদর্শ সাহিত্য-বিচারে না আনাই ভালো। এ-সব কথা যত সহজে বলা হয় এদের অর্থ তত সহজে পরিষ্কার হয় না। বক্তব্যকে পরিষ্কার

করে বিবৃত করা এবং বিষয়গত গম্ভীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা পণ্ডিতদের পক্ষেও লজ্জার বস্তু নয়। আর, বিদেশী নাম বাংলায় লেখার সময় বানানের অভিনবত্বের দিকে চেষ্টা না করাই ভালো। তা ছাড়া এই নামোল্লেখ যদি অপরিহার্যও হয় তবে একটু ভেবে-চিন্তেই নামগুলি বাছা ভালো। হেগেলের সঙ্গে হার্বার্ট রীডের নাম না করাই ভালো, "এরাজমুসের সঙ্গে বিদ্যাসাগর চরিত্রের গভীর মিল" আর একটু বিশ্লেষণ করে দেখা ভালো। "বলজাক-স্তাঁদালের উপন্যাস, দেগা-সেজানের চিত্রকলা, বেটোফেনের সংগীত, ইবসেনের নাটক, রোদ্যাঁর ভাস্কর্য, চেহফের গল্প, মন্তেসরীর শিক্ষাপদ্ধতি, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ, জুলিয়ান হাক্সলী—এরিক ফ্রেমের নীতিবিচার—এ সবই ওই (রেনেসাঁসী) জীবনবোধের বিচিত্র প্রকাশ"—এই ধরনের উক্তি কোনো পরিণতবুদ্ধি, বিচারনিষ্ঠ লেখকের পক্ষে গৌরবের নয়। এই সব অনায়াস তুলনা আর বিভিন্ন নামের চাঞ্চল্যকর যোগাযোগ দেখে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট দিনের কথা মনে পড়ে। এক অধ্যাপকের নির্দেশে একবার এলিয়টের সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল। সুরু করেছিলাম এলিয়টের সঙ্গে প্লেটোর এক অবিশ্বাস্য সাদৃশ্য আবিষ্কার করে। কিন্তু মাস্টারমশাই আমার বৈদগ্ধ্যে অভিভূত হলেন না। বিশেষ বাক্-সংযমী তিনি। কোনো মন্তব্য না করে শুধু খাতার একদিকে এই উক্তিটি লিখে রেখেছিলেন : "I tell you Captain, if you look in the maps of the 'Orld, I warrant you sall find in the comparisons between Macedon and Monmouth, that the situations look you, is both alike. There is a river in Macedon, and there is also moreover a river at Monmouth, it is call'd Wye at Monmouth: but it is out of my prains, what is the name of the other river: but 'tis all one, 'tis alike as my fingers is to my fingers, and there is salmons in both."

এত সব সত্ত্বেও যদি আলেকজাণ্ডার আর পঞ্চম হেনরী তুলনীয় না হয় তা'হলে তো পাণ্ডিত্যের পরিধি আর কল্পনার বিস্তার দেখানো কঠিন হয়ে পড়ে।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

The Three Voices of Poetry. *By* T. S. Eliot. Published for the National Book League. Cambridge University Press, London. The Literature of Politics. *By* T. S. Eliot. Foreword by the Right Honourable Sir Anthony Eden K.G., M.C., M.P. Conservative Political Centre.

এলিঅট্ সাহেবের আমি প্রাচীন ভক্ত। তাই তিনি কোথায় কি লিখলেন বা বললেন জানতে পারলে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আজকাল শুনছি উনত্রিশ সালের অর্থবিপাক নাকি আমাদের মধ্যবিত্ত মনে কশাঘাত করেছিল, কিন্তু আমার মনে আছে যে বিশত্রিশ দশকে অন্তত বইটই পাওয়া যেত অনেক সহজে এবং সস্তায়। গত যুদ্ধের সময় থেকে দেখছি বই পাওয়া-না-পাওয়া কপালের ব্যাপার, অন্তত আমার চেনা সব বইএর দোকানের পাড়ায়।

শুনেছি দিল্লীতে বোম্বাইতে নাকি তবু বইটই পাওয়া যায়।

এলিঅট্ সাহেবও তাঁর ভক্তদের কষ্ট দেন, তিনি হঠাৎ হঠাৎ বই প্রকাশ করেন এখানে ওখানে, সে বই প্রথমদিকেই পাওয়া দুষ্কর, পরে তো পাওয়াই যায় না। তিনি আবার নাকি বই প্রত্যাহারও করেন, যেমন করেছেন "আজব দেবতাদের সন্ধানে" নামক পুস্তকটি। "ক্লাসিক কাকে বলে" বইটি পাওয়া গেলেও ভর্জিল সম্বন্ধে ভাষণ বা মিল্টন বা ইএট্স্ সম্বন্ধে লেখাটি পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। "কবিতার সঙ্গীত" নামক অত্যন্ত মূল্যবান বক্তৃতাটিও দুর্লভ। তবু পেঙ্গুইন এলিঅটের গদ্যের এক চয়নিকা বার করে আমাদের উপকার করেছেন, যদিও তার সম্পাদকের রুচি স্বভাবতই যাকে বলে প্রাতিস্বিক বা ব্যক্তিগত ব্যাপার। "কবিতা ও নাটক" পুস্তকটির সঙ্গে "কবিতার তিনটি গলা" পুস্তিকাটি পড়লে লাভবান হওয়া যায়। এমনকি অনেক পাঠক বা সমালোচক অবাক হবেন যে এলিঅটের মতো সৎ কবি ও বিদগ্ধ সমালোচকও কবিতায় গলার একাধিক রকমফের সম্ভব মনে করেন। আজকাল অনেক তথাকথিত শুদ্ধকবিতাবিলাসী বুদ্ধিমন্য-তাবাদী পত্রিকায় প্রচারিত দেখি কবিকণ্ঠের এক রকম একেশ্বরবাদ। বলাই বাহুল্য এ একেশ্বরবাদ ছদ্মবেশী, এ বৌদ্ধ শূন্যবাদ তো নয়ই, এমন কি বস্তুত একেশ্বরবাদও নয়, এ শুধু এক রাজনীতির পক্ষপাতের বিরুদ্ধে আরেক সন্ত্রস্ত রাজনীতির প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ।

এলিঅট্ এ বিষয়ে বিরুদ্ধ আলোচনা করেছেন। আমাদের সাম্প্রতিক একদল সমালোচকদের সুরে তিনি একমত নন। খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে লেখা কারো কবিতা পড়তে মার্জিতরুচি ভদ্রলোক তিনি বিব্রত বোধ করেন, যে কথা শুধু একজন বলতে পারেন এবং আরেকজন শুনতে পারেন; সে কথা এলিঅটের মতে মুখোমুখি বলাই ভালো, বা চিঠিতে লেখাই সমীচীন। তাই মিসেস ব্রাউনিং-কে লেখা মিস্টর রবর্ট ব্রাউনিঙের কবিতা পড়ে তিনি আড়িপাতার লজ্জা পান, যেমন পেয়েছিলেন জোসেফ স্তালিন রুশকবি সিমোনভের অলগাকে লেখা কবিতা পড়ে,' এবং অবাক হয়েছিলেন দুকপির বেশি কেন ঐ বই ছাপা হয়েছে এই ভেবে!

কবিতার একটি স্বর যে দীর্ঘকাল ধ'রে সামাজিক ব্যাপার নিয়ে বিচলিত উচ্চকণ্ঠস্বর, এই কথাটা এলিঅট্ আবার মনে পড়িয়ে দিয়েছেন। ব্যঙ্গের কবিতা, বিতণ্ডার কবিতা, সংস্কারের কবিতা অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীতে চলে আসছে। সম্প্রতি বা রুশ-বিপ্লবের পরেই এর জন্ম এ কথাটা নেহাৎ কাব্যের ইতিহাসের অজ্ঞতা থেকে প্রসূত। এমন কি নিছক রাজনীতিরও যে সাহিত্য হয়, সে কথাটাও মনে রাখা ভালো। এলিঅট্ "রাজনীতির সাহিত্য" পুস্তিকায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শেষের দিকে তিনি বলেছেন যে হয়ত সাক্ষাৎ দৈনন্দিন রাজনীতিতে না জড়িত হয়ে ঠিক তার আগের মুহূর্তের মানসকে রূপদানেই রাজনৈতিক সাহিত্যের অধিক সার্থকতা। আর, এতদিন পরে এলিঅট্ কথা বলেছেন তাঁর এককালীন গুরু শার্ল মরা-র বিষয়ে, যিনি ফ্রান্সের মুক্তির সময়ে বিচারের ফলে মৃত্যুদণ্ডিত হন।

এই দুটি পুস্তিকাতেই এলিঅটের রচনাবৈশিষ্ট্য স্পষ্ট, বলা যেতে পারে যে একালের শ্রেষ্ঠ কবি ও অগ্রগণ্য সমালোচকের গদ্য কণ্ঠস্বর প্রায় শুনতে পাওয়া গেল।

বিষ্ণু দে

বাঙলা সাহিত্য পরিচয়—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ। কলিকাতা। আড়াই টাকা।
ব্যঞ্জনা ও কাব্য—হরিহর মিশ্র। গ্রন্থজগৎ। কলিকাতা। দুই টাকা।

সংক্ষেপে লেখা বাংলা সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য কোনো ইতিহাস নেই,—কথাটি শোচনীয় সন্দেহ নেই। সাধারণ অনুরাগীর কাজে লাগতে পারে, এবিষয়ে এমন কোনো বইয়ের নাম করা দুরূহ। যে বইগুলি লেখা হয়েছে, তাদের লক্ষ্য হয় ছাত্রসমাজ নয়তো বিশেষজ্ঞগোষ্ঠী। সন-তারিখের ভিড় এবং মামুলি কথার পুনরুক্তি পরিহার করে সরস অথচ তথ্যনিষ্ঠ, সুখ-পাঠ্য এবং নির্ভরযোগ্য একখানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হোক—এ কামনা বাংলা সাহিত্যের তথ্যান্বেষী সাধারণ পাঠকেরই কামনা। অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বোধ হয় সেই উদ্দেশ্যেই লিখতে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্যে তিনি পৌঁছতে পারেননি। বইয়ের নাম 'বাঙলা সাহিত্য পরিচয়',—কিন্তু ৯০ পৃষ্ঠার পুরো বইখানির মধ্যে প্রায় ২০ পৃষ্ঠা গেছে 'বাঙলা দেশ' এবং 'বাঙলা লিপি'-র আলোচনায়। তারপর মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, শিবায়ন, নাথসাহিত্য,—এই প্রসঙ্গগুলির ভূমিকাতেই বাকি ৭০ পৃষ্ঠা শেষ হয়েছে। ভূমিকাও মৌলিক নয়,—লেখক বলেছেন বটে, "বিষয়বস্তুর বিন্যাস-বৈচিত্র্যই নতুন, বইখানি বিচারের সময়ে এ-কথা মনে রাখা দরকার।"—কিন্তু বিন্যাসেও উল্লেখযোগ্য কোনো নতুনত্ব চোখে পড়লো না। বইখানির বিরুদ্ধে সাধারণ পাঠকের সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ এর নাম সম্পর্কে। রামায়ণ, শিবায়ন, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য—এই প্রসঙ্গ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে কি আর কিছুই নেই? ভারতচন্দ্রের জন্মকাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত প্রায় আড়াইশ' বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের যে বিপুল, বিচিত্র বিস্তার ঘটেছে, সে বিষয়ে 'বাঙলা সাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থের লেখক নীরব। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি আধুনিকতর, বাস্তবতর, বিচিত্রতর দেড়শ' বছরেও তেমন কিছুই কি ঘটেনি?

'রত্নসাগর' গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বরং দ্বিতীয় বইখানির মধ্যে। অধ্যাপক হরিহর মিশ্র মহাশয়ের 'ব্যঞ্জনা ও কাব্য' একখানি অভ্যর্থনাযোগ্য বই। শব্দ, অর্থ, অলঙ্কার একদিকে, আর, কাব্যের সৌন্দর্য অন্যদিকে,—এইভাবে বিষয়ের প্রতি কৌতূহল উদ্রেক করে,—মাত্র সাত পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁর প্রস্তাবটি বুঝিয়ে দিয়ে, বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অধ্যাপক মিশ্র যথাক্রমে শব্দের শক্তি, অভিধা, তাৎপর্য, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে অলংকারবাদ ও রীতিবাদের আলোচনা ছাপা হয়েছে।

বাংলায় এতৎপ্রসঙ্গের আলোচনামূলক বই যে একেবারে নেই, তা নয়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' ছাড়া সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'কাব্যবিচার' আছে। ডক্টর সুশীলকুমার দের বাংলা আলোচনা বিশেষ নেই তবে মাঝে-মাঝে তিনিও বাংলায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের ছোট বইখানি (বিশ্বভারতী—বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ) সুন্দর হয়েছে। ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্তের 'কাব্যালোক' অতিকায় গবেষণার বই। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'সাহিত্যের স্বরূপ' বইখানির মধ্যে এসব বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। নবেন্দু বসুর 'কবিতার প্রকৃতি' ঠিক এ ধরনের না হলেও এইসূত্রে স্মরণীয়। আরো দু'একখানি বাংলা বই আছে এসব বিষয়ে। অধ্যাপক মিশ্রের 'ব্যঞ্জনা ও কাব্য' এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজনা।

সংস্কৃতের সাহিত্যবিবেকের মধ্যে সাহিত্যবিশ্লেষণের যে রীতি দেখা দিয়েছিল তার সঙ্গে ব্যাকরণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ব্যঞ্জনাবাদও সেযুগে স্ফোটবাদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে

গিয়েছিল। মিশ্র মহাশয় স্ফোটবাদের কথা তোলেননি। শব্দের অভিধাশক্তি থেকেই তিনি যাত্রা শুরু করেছেন। শব্দার্থতত্ত্বের ব্যক্তিবাদ, জাতিবাদ, জাতিব্যক্তিসমাহারবাদ, বৌদ্ধ অপোহবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মতের পরিচয় পরিস্ফুট করে তিনি যথাক্রমে জাতিশব্দ, গুণশব্দ, ক্রিয়াশব্দ, এবং দ্রব্যশব্দ, এই চার শব্দশ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বাক্যার্থবোধের পক্ষে আবশ্যিক গুণাবলী—আসত্তি, যোগ্যতা এবং আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করে তাৎপর্যশক্তির পরিচয়সূত্রে অভিহিতান্বয়বাদ এবং অন্বিতাভিধানবাদ, এই দুই মতের প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন। লক্ষ্যার্থের পরিচিতির মধ্যে রূঢ়ি লক্ষণা এবং প্রয়োজন-লক্ষণার কথা দেখা গেল। গ্রন্থকার "প্রবন্ধবিস্তৃতি ভয়ে" তাঁর অভিপ্রেত অন্যান্য কথা বলেননি। কিন্তু তাঁর বলবার ভঙ্গি এবং বিষয়ের অধিকার সম্বন্ধে পাঠকের প্রতীতি ইতিমধ্যে এতো নিবিড়, এতো শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে যে তাঁর কাছ থেকে মম্মট প্রভৃতি আলঙ্কারিকদের এতদ্বিষয়ক ব্যাল্যবৈচিত্র্যের আলোচনা-প্রাপ্তির ঔৎসুক্য এতে পুনরপি পরিবর্ধিত হয়। ব্যঞ্জনার দুই শ্রেণীবিভাগ করে নিয়ে 'শাব্দী' এবং 'আর্থী' ব্যঞ্জনার যথাযথ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি। দৃষ্টান্ত পরিবেষণে তিনি অবশ্য সংস্কৃতেরই পক্ষপাতী। বাংলা দৃষ্টান্ত পেলে আরো ভালো হতো। এইসূত্রে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ে। শ্যামাপদবাবু খুবই কম লিখেছেন। কিন্তু যা লিখেছেন, তাতে সাধারণ বাঙালী পাঠকের প্রতি তাঁর সমবেদনার অন্ত নেই। তিরিশ থেকে ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার মধ্যে ব্যঞ্জনার কথা শেষ করে বাকি বাইশ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখক 'অলঙ্কারবাদ ও রীতিবাদের স্বরূপ-বিচার' করেছেন। এই অধ্যায়টিতে অবশ্য কয়েকটি বাংলা দৃষ্টান্ত আছে। অলঙ্কার-ভারাক্রান্ত অকাব্যের দৃষ্টান্ত তোলা হয়েছে ভারতচন্দ্র থেকে। নিরলঙ্কৃত রচনার কাব্য-গুণের দৃষ্টান্ত আহরণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে। ভামহ, দণ্ডী, রুদ্রট প্রভৃতি অলঙ্কারবাদীরা আসলে বাচ্যার্থবাদী,—বামনের রীতিবাদ আসলে শব্দার্থগুণবাদ; এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে তিনি বলেছেন, "অলঙ্কারবাদে যেমন অলঙ্কারের কোলাহলে অলঙ্কার্য চাপা পড়িয়াছে, রীতিবাদে তেমনি গুণের অন্তরালে গুণী অপ্রকাশিতই থাকিয়া গিয়াছে।" বলা বাহুল্য, এই নেতিবাচক সংকেতের পরে কাব্যরহস্যের জ্ঞানলাভের আগ্রহ নিবৃত্ত হতে পারে না। পরের কথা পরে বলবেন, এই ভরসা দিয়ে গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন। আশা করি, তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে বিলম্ব ঘটবে না।

হরপ্রসাদ মিত্র

A Certain Smile. *By* Françoise Sagan. E. P. Dutton. New York. $2.95.

প্রতীপবিচারেও মনে হয় না যে ফ্রাঁসোয়া সাগাঁর প্রথম বই *Bonjour Tristesse*-এ কোনো দর্শনের স্পর্শ ছিলো। হৃদয়তা ছিলো যথেষ্ট, কিন্তু সে-হার্দ্য কাহিনীতে ভারাতুরতা ছিলো ব'লে এখনো মনে হয় না। বরঞ্চ যা অবাক করে দিয়েছিলো সেই দু'বছর আগে, তা বিশেষ-এক কলাকৈবল্য, বক্তব্যের নির্ভার স্পষ্টতা। এমন স্বচ্ছ, প্রায় তুচ্ছ ভাষা, মাত্র তিনটি, বড় জোর চারটি, চরিত্রের টানাপোড়েন; তবু কী সেই নিপুণতা যা মনকে কেড়ে রাখে, হাল্কা নির্ভরে পাখি-মিলিয়ে-যাওয়া দিগন্তকে নামিয়ে নিয়ে আসে?

শ্রীমতী সাগাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসও বিস্ময়বহ, কিন্তু নতুনতর অর্থে। কাহিনী এবারও প্রেমের বিচিত্র গতি, বর্ণনায় এখনো সেই ঋজুতা, গল্পের মালমশলা আগের মতোই তুচ্ছতার গা ঘেঁষে : চিরাচরিত সেই ত্রিকোণ। কিন্তু যা অবাক করে দেয় তা জঁ-পল সার্ত্রের ঈষদাভাস। অবশ্য সমকালীন ফরাশি সাহিত্যে সার্ত্রের প্রতিবিম্ব-অতিক্রান্ত রচনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাহ'লেও, *A Certain Smile*-এর আগে, শ্রীমতী সাগাঁর রচনার সঙ্গে সাত্রীয় দর্শনের সাযুজ্য ভাবা প্রায় অসম্ভব ছিলো। *Bonjour Tristesse*-এ এক ধরনের নির্দয়তা ছিলো তা অনস্বীকার্য, কিন্তু সেটা হার্দ্যতারই অন্যতম প্রকরণ, সম্পূর্ণ আবেগজাত প্রক্রিয়া। যদি বিশ্লেষণের অরণ্যে ঢুকতেই হয়, তা হ'লে বরঞ্চ এ পর্যন্ত বলা চলে *Bonjour Tristesse* ইলেকট্রা-মানসিকতার নিরাড়ম্বর উদাহরণ, লরেন্সের *Sons And Lovers*-এ পল মরেলের ঈদিপাস-চেতনার সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল।

কিন্তু ইলেকট্রা-ঈদিপাস দু'টোই তো বহুকালের বাসি প্রসঙ্গ। অন্যপক্ষে, *A Certain Smile* পাঠান্তে বিবৃতির যে রেশটা মনে লেগে থাকে, তা তীক্ষ্ণতায় স্পর্ধিত, শ্রীমতী সাগাঁর কৈশোরিকতা-মাখানো ভাষার গোধূলি-আলোর ভিতর দিয়ে ছিটকে-আসা বলেই দ্বিগুণতর তার তীক্ষ্ণতা।

এবারও সেই পারিস, সরবঁয়ে-পড়া মেয়ে, যদিও পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি কিনা তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। মেয়েটির নাম দমিনিক, প্রেমিকের নাম বায়ারত্রাঁদ। ছাত্রপ্রেমের অভ্যস্ত উপকরণ : কাফে, বই-পড়া, পার্টি, পছন্দের নাইটক্লাব। যৌবন হয়তো আগুন, কিন্তু গতানুগতিকতার শৃঙ্খলে সমস্ত উপভোগই বিস্বাদ হ'য়ে আসে, দমিনিককে ক্লান্ত ক'রে আনে। সে-আগুন জ্বলে যায়, অথচ সত্যিই যেন কিছু দহন করে না। বিশেষ ক'রে নিথর দমিনিকের মনে হয় বায়ারত্রাঁদ বড়ো বেশি ভাবপ্রবণ।

এমন সময় বায়ারত্রাঁদের মামা, লুক্, বয়সে শ্রীমতীর দ্বিগুণেরও বড়ো, যাকে দেখেই তার মনে হলো—অমন মাংসল, পেশীবহুল, মাদকতামাখানো চেহারা—'এ হচ্ছে সেই ধরনের লোক যারা আমার বয়সী মেয়েদের ধর্ষণ করতে ভালোবাসে'। হয়তো সেজন্যেই, এগিয়ে গিয়ে নিজেকে ধরা দিলো সে। তাছাড়া, বিশেষ ক'রে যা তাকে আকর্ষণ করলো, লুকের হৃদয় বায়ারত্রাঁদের মতো আদৌ দ্রবীভূত নয়, বাষ্পের পরিমাণ কম। এ-প্রেমে সুতরাং নিছক শরীরচেতনার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তার উপর, লুকের স্ত্রী ফ্রাঁসোয়া এ-ধরনের ব্যাপারে যথেষ্ট উদার।

এর পর অবশ্য ছক কেটে প্রেম। কড়া, ঝাঁঝালো স্বাদে দমিনিকের আসক্তি; নির্জলা হুইস্কী, বয়স্ক, বলিষ্ঠ, বিবাহিত, মধ্যবয়সী পুরুষের সঙ্গে শরীরসম্বন্ধ। সম্ভবত, পারস্পরিক চুম্বকতার সবচাইতে বড়ো কারণ উভপাক্ষিক সাত্রীয় প্রস্থানে : যেহেতু শরীর ছাড়া কিছুই দিতে হবে না পরস্পরকে, তাই কারোরই সত্তাস্বাধীনতা হারাবার ভয় নেই। এ-সম্বন্ধ দ্রুত, স্বচ্ছন্দ লীলায় সম্ভোগ শীর্ষে পেঁাছে চললো। চরমতা এলো যখন তারা দু'সপ্তাহ একসঙ্গে এক ঘরে রিভিয়েরায় কাটিয়ে এলো।

কিন্তু এখানেই বিবৃত্তির সহসা অবরোহণ। দমিনিক সহজেই লুকের মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলো : দু'সপ্তাহ একত্র যাপনের পর সমস্ত আবেগই নিঃশেষ হয়ে আসে, সব ক'টি বিভঙ্গ অভ্যস্ত ব'লে মনে হয়, রক্তে কোনো অনুক্ত উত্তাপ থাকে না, শরীরের কোনো অপঠিত কোণ। অতএব বসন্ত তোর শেষ করে দে রঙ্গ।

লুক্ যেহেতু মুক্তপুরুষ, এবং অনেকগুলি অভিজ্ঞতার ঋতু তার পিছনে, দমিনিকের

পক্ষে তাকে বেঁধে রাখবার প্রয়াস অসফল হ'তে বাধ্য। শুধু তা-ই নয়, তার নিজের দিক থেকেও সে-রকম চেষ্টা করা চারিত্রিক স্খলন। কারণ তা থেকেই গতানুগতির ক্লান্তি, মুক্তির সেখানে অবরোধ। অবশ্য যুবতী মেয়ে দমিনিকের এখনো বেদনার সেতু পেরিয়েই এই উপলব্ধিতে পেঁাছুতে হয়। একচারিতার সংস্কার দীর্ণ করেই তবে বহুগামিতার মুক্তি; বুদ্ধি সে-সংস্কার অনেকদিন আগে অতিক্রম করে এলেও রক্তে তবু, সাময়িকভাবে হ'লেও, অন্যতর দোলা। বইয়ের যেখানে শেষ, দমিনিক সেখানে অভিজ্ঞতাতেও স্থিত হয়ে এসেছে; 'আমি, এক নারী, এক পুরুষকে ভালবেসেছিলাম; আর কিছু নেই' : এই উক্তিতে বোঝা যায় অবশেষে সাত্রীয় দর্শনের সারাৎসার স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

Bonjour Tristesse-এও একটি শান্ত বিষাদের সুর বরাবর প্রচ্ছন্ন ছিলো, কিন্তু সেটা শুধুই বর্ণনার ভঙ্গিতে। শ্রীমতী সাগাঁ এবার বিষাদকে আরো স্পষ্ট ক'রে বরণ করলেন; ব্যথাকে স্বীকার ক'রে নেওয়াতেই যেন আশা, নিষ্ঠাতেই যেন জীবনের পুঞ্জিত ক্লান্তি, ভালোবাসাকে সীমিত করতে পারাই মুক্তি। অবশ্য আরো সমতলে নেমে এসে বলা চলে, শ্রীমতী সাগাঁ *A Certain Smile*-এ *Bonjour Tristesse*-এর প্রতিতুলনা আঁকছেন। দুই গল্পেই অদ্ভুত এক অবসাদের স্বাদ, কিন্তু একটিতে নায়িকার আপাত-জয়ের বর্ণনা, অন্যটি নায়িকার পরাজয়কাহিনী, এবং, হয়তো, লেখিকা বলতে চাইছেন, জয় আর পরাজয় দুই-ই শেষ পর্যন্ত বিষাদের বিশাল নিবিড় ক্যান্‌ভাসে বিলীন হয়ে যায়। সেই সঙ্গে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে যে, শ্রীমতী সাগাঁ এ-বইতেও ইলেকট্রা-চেতনার পুনরুক্তি করছেন মধ্যবয়সী পুরুষের প্রতি দমিনিকের আসক্তির ভিতর দিয়ে।

কিন্তু শেষোক্ত দু'টো প্রসঙ্গই আমি বলবো আনুষঙ্গিক : প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে শ্রীমতী সাগাঁর দর্শনবিন্যাস। এমন একটি সরল কাহিনীর বুননে এই দর্শন বিবৃত হয়েছে ব'লেই আরো বেশি চমকে উঠতে হয়। তবে, দু'টো মাত্র বইয়ের অভিজ্ঞতা থেকেই বলা চলে, শ্রীমতী সাগাঁর চমক-লাগানোর এই সবে শুরু।

অশোক মিত্র